ভারতের রণনীতি
ও
সমর সজ্জা

(সামরিক ও রাজনৈতিক)

প্রথম খণ্ড

বিশ্বেশ্বর চৌধুরী—

ইউনিভারস্যাল্ পাবলিশার্স
২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

উৎসর্গ

দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎগণকে
স্মরণ করিয়া
অজয়েশ, অলকেশ, অতসী, অরুণেশকে
দিলাম।

প্রথম অধ্যায়

আমাদের দেশ

একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের যুক্তিহীন সর্ব্বনাশা দাবী দীর্ঘ দিন শাসন ও শোষণকারী অপর একটি বিজাতি ও বিধর্ম্মীর স্বার্থান্ধ, সবল ও সক্রিয় সমর্থন লাভ করিবার ফলে সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং— বিশ্ব সভ্যতার অতি প্রাচীন লীলাভূমি বিশাল ভারত আজ খণ্ডিত। পরাধীনতার অসহায় অবস্থার সুযোগে একটি সুপ্রাচীন দেশের অঙ্গচ্ছেদ দ্বারা সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ঐতিহ্য নষ্ট করিয়া দেশ ও জাতির বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতকে সমগ্রভাবে ব্যর্থ করিবার এত বড় নির্লজ্জ, হীন ও গভীর ষড়যন্ত্রের নজীর মানব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই ভাবে দেশ বিভক্ত হইবার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির ভয়াবহ চিত্র মানসপটে উদিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রকৃত সন্তান মাত্রেরই মন যে দুঃখ, অপমান, বেদনা ও ভয়ে বিষাক্ত হইয়া সুতীব্র জ্বালার সৃষ্টি করে ইহার তীব্রতা ও গভীরতাকে অস্বীকার করিবার কোন যুক্তি সঙ্গত উপায় নাই।

একান্ত অসহায় ভাবে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্বে যে অবাঞ্ছিত সিদ্ধান্ত উদ্গত অশ্রু চাপিয়া কম্পিত বক্ষে ভারতীয় নরনারীদের মানিয়া লইতে হইয়াছে এবং তৎফলে যে কতক বিশেষ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য ভারতীয় নরনারীর উপর আরোপিত হইয়াছে উহারই একটি বিশেষ দিক আলোচনা আমার লক্ষ্য। মূল প্রসঙ্গ অবতারণার পূর্ব্বে ইহাও বলিয়া রাখা অবশ্য প্রয়োজন মনে করি যে, বিদেশী, বিধর্ম্মী পুঁজিবাদীদের কূটচক্রান্তে বিভ্রান্ত হইয়া ভারতের

হিন্দু ও মুসলমান নরনারী আজ যে বিরাট ভুল করিলেন সেই ভুলের হিমালয় প্রমাণ বোঝা দীর্ঘ দিন তাঁহাদের বহন এবং বংশ পরম্পরায় তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণকে সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

ভারত আজ খণ্ডিত। দেশ ব্যাপী দূষিত ক্ষতের সুতীব্র জ্বালা সৃষ্টির সুপরিকল্পিত ও অমোঘ নীতি অনুসরণ করিয়া ভারতকে খণ্ড বিখণ্ডিত করা হইয়াছে। বিভক্ত দেশ খণ্ডের অভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও অখণ্ডত্ব অর্থাৎ সীমান্ত ভারতীয় নরনারীদের রক্ষা করিতে হইবে। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ের আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে, দেশ রক্ষা অর্থাৎ সীমান্ত রক্ষার বিরাট ও কঠোর দায়িত্বের যাবতীয় দিক পর্য্যালোচনা, সমস্যার স্বরূপ নির্দ্ধারণের পর সমাধানের সূত্র ও উহাকে কার্য্যকরী করিবার পন্থা উদ্ভাবনই আমার মূল লক্ষ্য।

দেশ রক্ষা ব্যবস্থা সংগঠনের ক্ষেত্রে সর্ব্ব প্রথম দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের বিষয় আলোচনা অপরিহার্য্য। বহিরাক্রমণ প্রতিরোধের জন্য আত্মরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইলে পাল্টা আক্রমণ পরিচালন শক্তিকে সর্ব্বদিক হইতে সুসংবদ্ধ করিয়া তোলা কর্ত্তব্য। এই ক্ষেত্রে স্বদেশ সীমা ও সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলের স্থল ও জল ভাগ এবং আবহাওয়া সম্বন্ধীয় তথ্যাদি বিশেষ ভাবে পরিজ্ঞাত থাকা প্রয়োজন। উল্লিখিত বিষয়গুলির বিস্তারিত আলোচনা আরম্ভের পূর্ব্বে ইহাও বিশ্ব নর-নারীকে জানাইয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি যে, আঞ্চলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ পররাজ্যজয়ের অতি সামান্য ইচ্ছা অথবা প্রয়োজন ভারতীয় নরনারীর নাই। তবে আপোষে শান্তিপূর্ণ ভাবে ভারতের খণ্ডিত অংশ গুলিকে পুনরায় ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করিবার ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত মহান সঙ্কল্প ভারতীয় নরনারীর মনে আবহমান-কাল জাগরুক থাকিবে। এমন কি বিভক্ত ভারতকে এক ও অখণ্ড রূপে পাইবার জন্য তাঁহারা সানন্দে যে কোনরূপ দুঃখ, কষ্ট, ত্যাগ বরণে সর্ব্বক্ষণ

প্রস্তুত থাকিবেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্র এবং এশিয়া, ইউরোপ আফ্রিকা ও আমেরিকার ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কোন রাষ্ট্রের প্রতি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্বেষ ভাব থাকিবে না—প্রত্যেকটী রাষ্ট্রের সহিত সদিচ্ছা ও সদ্ভাবের ভিত্তিতে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া বিশ্ব শান্তি ও প্রগতির পথ উন্মুক্ত রাখার সুমহান সঙ্কল্প লইয়া ভারতীয় নরনারী চিন্তা-ভাব-কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট থাকিবেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য মনে করি যে, ভারতীয় নরনারী যেমন পররাজ্য গ্রাসের অতি ক্ষুদ্রতম আশা পোষণ করেন না তদ্রূপ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক স্বার্থের ক্ষতি অথবা সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমি অপর কোন রাষ্ট্র কর্ত্তৃক গ্রাসের ক্ষীণতম প্রচেষ্টাকে তাঁহারা কোন অবস্থাতেই বরদাস্ত করিবেন না। এক কথায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র যেমন বিশ্বের কোন অঞ্চলে কোন শ্রেণীর উপদ্রব সৃষ্টি করিতে প্রস্তুত নহে—তদ্রূপ বিশ্বের অপর কোন রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রগোষ্ঠি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কোন অংশে উপদ্রব সৃষ্টি করুক ইহা তাঁহারা কোন কারণে কোন অবস্থাতে সহ্য করিবেন না।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যভাগে একটী বিশাল চতুর্ভুজাকৃতি উপদ্বীপ। অবশ্য দাক্ষিণাত্যই প্রকৃত পক্ষে উপদ্বীপ। ইহা দক্ষিণে ৮° উঃ অঃ হইতে উত্তরে ৩৭° উঃ অঃ পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে ৬১° পূঃ দ্রাঘিমা হইতে পূর্ব্বে ৯৭° পূঃ দ্রাঘিমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কর্কট ক্রান্তি ইহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে। ইহার দক্ষিণাংশ গ্রীষ্মমণ্ডলে এবং উত্তরাংশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্গত। উচ্চ পর্ব্বত, দীর্ঘ নদী, বিস্তীর্ণ সমভূমি, মরুভূমি, হ্রদ, প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক মূর্ত্তি এবং বৃষ্টি, তুষারপাত বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু ও ঋতু প্রভৃতি ভৌগোলিক ঘটনার সবই ভারতে পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য ভারতকে একটী ক্ষুদ্র পৃথিবী বলে।

সীমা :—উত্তরে হিমালয়, চীন গণতন্ত্র ও সোভিয়েট রুশিয়া ; উত্তর-পূর্ব্বে :—পাটকাই, লুসাই পাহাড় ; পূর্ব্বে :—পূর্ব্ব-পাকিস্থান ব্রহ্মদেশ ও

বঙ্গোপসাগর ; উত্তর-পশ্চিমে :—সুলেমান, হিন্দুকুশ ও ক্ষীরথর পর্ব্বতমালা.-
পশ্চিম-পাকিস্থান, আফগানীস্থান ও পারস্য। পশ্চিমে :—আরব সাগর।
দক্ষিণে :—ভারত মহাসাগর। প্রায় ৬০০০ মাইল পার্ব্বত্য সীমা স্থলপথে
এবং প্রায় ২৫,০০ মাইল দীর্ঘ কিন্তু পোতাশ্রয়ের অনুপযুক্ত উপকূল সীমা
ভারতকে জলপথে বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করে।

ভু-প্রকৃতি

বন্ধুরতা হিসাবে ভারতকে চারিটি নৈসর্গিক ভাগে বিভক্ত করা
হয়। পার্ব্বত্য অঞ্চল। ইহা আবার তিন ভাগে বিভক্ত।

(ক) উত্তরে হিমালয় ও কারাকোরম পর্ব্বত। পামীর গ্রন্থি হইতে
হিমালয় অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে দক্ষিণ-পূর্ব্বে ও পরে পূর্ব্ব দিকে চলিয়া গিয়াছে।
হিমালয় পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় দেড় হাজার মাইল দীর্ঘ ও উত্তর-দক্ষিণে প্রায়
১৫০ হইতে ২৫০ মাইল প্রস্থ। হিমালয়ের উচ্চস্থানে হিমবাহ ও গাত্রে
গভীর অরণ্য এবং মধ্যে মধ্যে বিস্তৃত উপত্যকা ও মালভূমি আছে।
হিমালয়ের গড় উচ্চতা প্রায় ২০ হাজার ফুট। হিমালয়কে কয়েকটি অংশে
ভাগ করা যায়।

(১) সর্ব্ব দক্ষিণে হিমালয়ের পাদদেশে প্রায় ১০০ মাইল দীর্ঘ
নিম্ন পাহাড় শ্রেণী বা অব-হিমালয় নেপাল হইতে পশ্চিমে শিবালিক
পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

(২) ইহাদের উত্তরে উচ্চ পর্ব্বতমালা হইতে বাহিত শিলাখণ্ড
ও পলল পূর্ণ উর্ব্বরা নিম্ন উপত্যকা ভূমি। ইহার পশ্চিম ভাগকে
'ডুন' ও পূর্ব্ব ভাগকে 'মারে' বলে।

(৩) উপত্যকার উত্তরে মধ্য বা উপ হিমালয় পর্ব্বতমালা ৬ হইতে
১২ হাজার ফুট উচ্চ। কাশ্মীর উপত্যকা ও উলার হ্রদ এই শ্রেণীতে
অবস্থিত।

(৪) ইহার উত্তরে হিমালয়ের প্রধান ও সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিত। ইহার গড় উচ্চতা ২০ হাজার ফুট। এই শ্রেণীতে নেপালে কাঞ্চনজঙ্ঘা (২৮১৫৬ ফুট), পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভারেষ্ট (২৯১৪২ ফুট), ধবলগিরি (২৬৮২৬ ফুট) যুক্ত প্রদেশে বদ্রীনাথ, কামেত, নন্দা দেবী, গোসাইস্থান, চম্বলহরি ও কাশ্মীরের নন্দা পর্ব্বত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য শৃঙ্গ আছে।

(৫) তিব্বতের মালভূমি ও এই পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে আর একটি নিম্নভূমি আছে। ইহার মধ্যে বিখ্যাত মানস সরোবর অবস্থিত।

(৬) হিমালয়ের পূর্ব্ব ভাগের নিম্ন অংশের জঙ্গলাকীর্ণ তরাই অঞ্চল।

পামীর গ্রন্থি হইতে পূর্ব্বদিকে কারাকোরম পর্ব্বত শ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ গডউইন্‌অষ্টেন পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চ শৃঙ্গ। কারাকোরমের দক্ষিণ-পূর্ব্ব শাখায় কৈলাস পর্ব্বত অবস্থিত।

(খ) পামীর সন্ধি হইতে পশ্চিমে হিন্দুকুশ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে সফেদকো, সুলেমান ও ক্ষীরথর পর্ব্বতমালা চলিয়া গিয়াছে। ইহাদের গড় উচ্চতা ৬ হাজার ফুটের বেশী নয়।

(গ) হিমালয়ের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পাটকই, নাগা, লুসাই ও আরাকান ইউমা পর্ব্বতশ্রেণী বরাবর উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত। এই পর্ব্বতশ্রেণী হইতে পশ্চিম দিকে খাসিয়া, জন্তিয়া ও গাড়ো পাহাড় আসামের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

গিরিদ্বার

উত্তর-পশ্চিমে নদী উপত্যকায় যাতায়াতের জন্য তিনটি প্রধান গিরিদ্বার আছে। হিন্দুকুশ ও সুলেমানের মধ্যে ৩৪০০ ফুট উচ্চে খাইবার গিরিদ্বার অবস্থিত। এই গিরিদ্বার ও কাবুল নদীর উপত্যকা

দিয়া পেশোয়ার হইতে কাবুল গমনাগমনের শ্রেষ্ঠ পথ রহিয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া লান্দিখানা হইতে জামরুদ পর্য্যন্ত রেলপথ গিয়াছে। এই গিরিদ্বার দৈর্ঘে ৬০ মাইল।

বোলান গিরিদ্বার সুলেমান পর্ব্বতের মধ্যে অবস্থিত। ইহার মধ্য দিয়া জাকোকাবাদ হইতে কোয়েটা হইয়া আফগান সীমান্তের চামান ও নবকুন্দি পর্য্যন্ত রেলপথ গিয়াছে। এই পথ দিয়া তেহরান ও কান্দাহার যাওয়া যায়। গোমল গিরিদ্বার দিয়া ডেরা ইসমাইল খাঁ হইতে ইরাণের মালভূমিতে যাইবার পথ আছে।

নেপালের কাটামুণ্ড হইতে দুইটি পথ, দার্জ্জিলিং হইতে চুম্বি উপত্যকা দিয়া একটি পথ এবং সিমলা হইতে শতদ্রুনদী উপত্যকার সিপ্‌কি গিরিদ্বার দিয়া কয়েকটি পথ তিব্বত গিয়াছে। লে হইতে কারাকোরমের সসার গিরিদ্বার দিয়া এবং শ্রীনগর হইতে জোজিলা গিরিদ্বার দিয়া তুর্কীস্থানে যাওয়া যায়। উত্তর দিকের এই সকল পথ তুষারাবৃত ও দুর্গম।

ভারত ও ব্রহ্মের পার্ব্বত্য সীমায় টুজু, মণিপুর, শান ও টংগুপ গিরিদ্বার প্রসিদ্ধ।

মধ্যের সমভূমি

হিমালয় হইতে দক্ষিণাপথের মালভূমি পর্য্যন্ত প্রায় ১৪০ মাইল হইতে ২৫০ মাইল প্রশস্ত এবং আসাম হইতে পশ্চিম পাকিস্থান পর্য্যন্ত প্রায় ২৫০০ মাইল দীর্ঘ। সিন্ধু, গঙ্গা, যমুনা নিম্ন-ব্রহ্মপুত্র ও উহাদের যাবতীয় শাখা প্রশাখা এই সমভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত।

দিল্লী হইতে আরাবল্লী পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ১০০০ ফুট উচ্চ একটি শৈলশিরা এই সমভূমিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই শৈলশিরা গঙ্গা ও সিন্ধুর মধ্যে একটি গৌণ জল বিভাজিকা। ইহার

পশ্চিম দিকে সিন্ধুর অববাহিকা দক্ষিণ-পশ্চিমে ঢালু এবং পূর্ব্ব দিকে গঙ্গার অববাহিকা দক্ষিণ-পূর্ব্বে ঢালু। ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকা হিমালয় হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ঢালু হইয়া গিয়াছে। এই উচ্চ ভূমির দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে থরমরুভূমি অবস্থিত। ইহা রাজপুতানা হইতে সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলে গঙ্গার উত্তর ও দক্ষিণ তীরের জমি ক্রম-উচ্চ হইয়া যথাক্রমে হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্ব্বতের সহিত মিশিয়াছে। এই সমভূমিতে কোথাও পাহাড় নাই এবং কোন অংশই সমুদ্র সমতল হইতে ৫০০ বা ৬০০ ফুটের অধিক উচ্চ নহে।

দক্ষিণের ত্রিভুজাকার মালভূমি

ইহা কর্কটক্রান্তির দক্ষিণে অবস্থিত এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে সাতপুরা—মহাদেব—মহাকাল পর্ব্বত শ্রেণী দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত।

(ক) উত্তরে মধ্যভারতের মালব মালভূমি; ইহা পশ্চিমে আরাবল্লী পর্ব্বত শ্রেণী হইতে পূর্ব্বে রাজমহল ও কৈমুর পাহাড় পর্য্যন্ত বিস্তৃত।•

(খ) দক্ষিণে দক্ষিণাপথের মালভূমি তাপ্তি নদীর উপত্যকা হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সমগ্র মালভূমির গড় উচ্চতা দেড় হাজার হইতে তিন হাজার ফুট। আরাবল্লীর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ আবু পাহাড় ৪০০০ ফুট। সাতপুরার পূর্ব্বে মহাকাল ও ছোট নাগপুরের পাহাড় এবং উত্তরে বিন্ধ্য ও দক্ষিণে অজন্তা পর্ব্বত শ্রেণী। এই সকল পর্ব্বত শ্রেণী গৌণ জল বিভাজিকা এবং উত্তর ভারত হইতে দক্ষিণ ভারতকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।

দক্ষিণাপথ মালভূমির পশ্চিম প্রান্তে পশ্চিমঘাট পর্ব্বত শ্রেণী ও পূর্ব্ব প্রান্তে পূর্ব্বঘাট বা মলয়াদ্রি পর্ব্বতশ্রেণী এবং উত্তর প্রান্তে সাতপুরা পর্ব্বত শ্রেণী অবস্থিত। পশ্চিম ও পূর্ব্বঘাট দক্ষিণে নালগিরি পর্ব্বতে

মিশিয়াছে। নীলগিরির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ দোদাবেতা ৮৭০০ ফুট। নীলগিরির দক্ষিণে যথাক্রমে আন্নামালাই ও কার্ডামম পর্ব্বত অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বে পাল্‌নি পাহাড়। আন্নামালাই পর্ব্বতের আনাইমুদী ৮৮৬০ ফুট দক্ষিণাপথের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। পশ্চিম ঘাটের গড় উচ্চতা ৪০০০ ফুট এবং সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ মহাবালেশ্বর ৪৫০০ ফুট। পূর্ব্বঘাটের গড় উচ্চতা ২০০০ ফুট এবং সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ মহেন্দ্রগিরি ৫০০০ ফুট। এই মালভূমি পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে ক্রমনিম্ন বলিয়া দক্ষিণাপথের অধিকাংশ নদী পূর্ব্ব বাহিনী। পশ্চিমঘাটে গ্রীষ্মে এবং পূর্ব্বঘাটে শীতে বৃষ্টি হয়। পূর্ব্বঘাট শ্রেণী একটানা নহে। মধ্যে মধ্যে নদীর উপত্যকা আছে। পশ্চিমঘাট শ্রেণী একটানা এবং নীলগিরির পর সঙ্কীর্ণ পালঘাট, নাসিকের নিকট থলঘাট ও পুণার নিকট ভোরঘাট গিরিপথ এবং ইহার মধ্য দিয়া রেলপথ গিয়াছে। পশ্চিম ঘাট হইতে ভূমি খাড়াভাবে এবং পূর্ব্বঘাট হইতে ধীর ঢালে নামিয়া সমুদ্রজলের সহিত মিশিয়াছে।

উপকূল, তটরেখা, দ্বীপ

আয়তনের তুলনায় ভারতের উপকূল ভাগ বৃহৎ হইলেও উহা অভগ্ন। সমুদ্র জল তটভূমি ভেদ করিয়া স্থল ভাগে বেশীদূর প্রবেশ করে নাই। সেইজন্য উপকূলে সাগর, উপসাগর, উপদ্বীপ ও দ্বীপ কম এবং উপকূল সমুদ্রের গড় গভীরতা মাত্র ৬০০ ফুট। মহীসোপান কেরল, গোয়া, করাচী ও বঙ্গদেশের দক্ষিণে ১০০ মাইল চওড়া। অন্যত্র খুব সঙ্কীর্ণ। অগভীর সমুদ্রে খুব প্রবল তরঙ্গ ও ঝড় হয়।

পশ্চিম উপকূল—এই উপকূলে সমুদ্র হইতে অনতিদূরে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণী অবস্থিত। উপকূলে সংকীর্ণ ত্রিশ মাইল প্রশস্ত নিম্ন সমভূমি আছে। গোয়া হইতে উত্তর উপকূলকে কঙ্কন ও দক্ষিণ উপকূলকে

মালাবার বলে। পশ্চিম ঘাটে গ্রীষ্মে প্রচুর বৃষ্টি হয়। এখানে গভীর বন আছে এবং মালবার উপকূলে সংকীর্ণ কিন্তু খরস্রোতা নদী আছে।

পশ্চিম উপকূলের নিকট সমুদ্র অপেক্ষাকৃত গভীর, কিন্তু উপকূল পর্ব্বতাকীর্ণ। সিন্ধুর ব-দ্বীপ নিম্ন ও সমতল। এই উপকূলে সুরাট ও মাহে বন্দর বাঁধ নির্ম্মিত কৃত্রিম পোতাশ্রয়; কিন্তু বোম্বাই গোয়া দমন ও কোচিন বন্দর স্বাভাবিক পোতাশ্রয়। কাম্বে ও কচ্ছ উপসাগর এবং ইহাদের মধ্যস্থিত কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ এই অংশে অবস্থিত। বোম্বাইর নিকট সলসেট ও বেসিন দ্বীপ অবস্থিত। আরব সাগরে মালদ্বীপ ও লাক্ষা দ্বীপ নামক দুইটি প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ আছে।

ভারতবর্ষ ও সিংহল দ্বীপের মধ্যে মান্নার ও রামেশ্বর দ্বীপ, আদম সেতু, পক্‌প্রণালী ও অগভীর মান্নার উপসাগর অবস্থিত।

পূর্ব্ব উপকূল

কুমারিকা হইতে গঙ্গার ব-দ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত উপকূলের দক্ষিণ ভাগকে করমণ্ডল ও উত্তর ভাগকে নর্দ্দান সার্কাস্ বলা হয়। পশ্চিম উপকূল অপেক্ষা এই উপকূল বেশী প্রশস্ত ও সমতল এবং কম শিলাময়। এই অংশে রাস্তা ও রেলপথ অধিক। উপকূল সমুদ্র অগভীর ও তরঙ্গবিক্ষুব্ধ। মাদ্রাজ কৃত্রিম পোতাশ্রয়। এই উপকূলে মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীর উর্ব্বরা ব-দ্বীপ অবস্থিত। ইহাদের দুই উপকূলে উপহ্রদ আছে। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন উপকূলের উপহ্রদ এত অগভীর ও বালুর চরে পূর্ণ যে ইহাদের মধ্যে জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে না। পূর্ব্ব উপকূলে চিল্কা পুলিকট ও কোলার লবণ হ্রদ আছে। বাঙলার দক্ষিণে অরণ্যময় নদীবহুল জলাভূমি পূর্ণ সুন্দরবন। পূর্ব্ব উপকূলে কলিকাতা, পণ্ডিচেরী, ভিজাগাপট্টম ও মাদ্রাজ বন্দর অবস্থিত। কলিকাতা ও মাদ্রাজে কৃত্রিম পোতাশ্রয়

আছে। বঙ্গোপসাগরে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত পর্ব্বত শ্রেণীর চূড়া।

নদ-নদী

উত্তর ভারতে সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এই তিনটি প্রধান নদী হিমালয়ের তুষার হইতে জন্মলাভ করিয়াছে এবং মৌসুমী বৃষ্টি ও তুষার গলা জলে পুষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের উৎপত্তি স্থল ভারত সীমানার বাহিরে।

সিন্ধু—(১৭০০ মাইল)—হিমালয়ের উত্তরে তিব্বতের নিম্ন অংশে মানস সরোবর ও কৈলাস পর্ব্বতের নিকটে ১৭ হাজার ফুট উচ্চস্থানে তিনটি জলধারা হইতে উৎপন্ন হইয়া সিন্ধুনদ তিব্বতের নিম্নভূমি, কাশ্মীর ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম পার্ব্বত্য অঞ্চল, পাঞ্জাব, রাজপুতনা ও সিন্ধুর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মোহনায় বৃহৎ ব-দ্বীপ সৃষ্টি করিয়া আরব সাগরে পড়িয়াছে। ইহা পার্ব্বত্য অঞ্চলে অনেক গভীর গিরিপথ ও হ্রদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ইহা নাঙ্গা পর্ব্বত পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য অংশে ছয়শত মাইল উত্তর-পশ্চিম বাহিনী ও তথা হইতে সমভূমি অংশে ১১ শত মাইল দক্ষিণ বাহিনী। হিন্দুকুশ হইতে গিলগিট, কারাকোরম হইতে শ্যোক ও আফগানিস্থান হইতে গোমল, কাবুল ও কুরুম নদী ইহার দক্ষিণ তীরে এবং পাঞ্জাবের পঞ্চনদ—শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা বাম তীরে ইহার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে শতদ্রু (নয়শত মাইল) দীর্ঘতম। ইহা রাকাজ তালহ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বিতস্তা ও ইরাবতী চন্দ্রভাগাতে মিলিত হইয়াছে। বিপাশা শতদ্রুর সহিত মিলিত হইয়াছে। কুনার ও সোয়াত কাবুল নদীর, তোচি কুরুম নদীর ও জেহব গোমল নদীর উপনদী।

গঙ্গা:—(১৫২৪ মাইল) মধ্য হিমালয়ের গঙ্গোত্রী নামক হিমবাহ হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গা ২৩০ মাইল পার্ব্বত্য অঞ্চল দিয়া প্রথমে

দক্ষিণে পরে দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রবাহিত এবং হরিদ্বারের নিকট সমভূমিতে প্রবেশ করিয়া পরে পূর্ব্ববাহিনী। পরে যুক্ত প্রদেশ ও বিহারের মধ্য দিয়া ইহা বাঙলায় প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ বাহিনী হইয়া ভাগীরথী ও পদ্মা নামক দুইটি শাখায় বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। উৎপত্তি স্থলে গঙ্গা ১৫ ইঞ্চি গভীর ও ২৭ ফুট চওড়া এবং মোহনার নিকট প্রায় ২৫ মাইল প্রশস্ত।

হিমালয়ের যমুনোত্রী নামক হিমবাহ হইতে উৎপন্ন হইয়া যমুনা নদী ডান দিক হইতে প্রয়াগে গঙ্গার সহিত মিলিত। হিমালয় হইতে অলকানন্দা, রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডকী ও কুশীনদী গঙ্গার বাম দিক হইতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে সিন্ধু, কালী, চম্বল ও বেতোয়া পূর্ব্ব রাজপুতনার মধ্য দিয়া যমুনার সহিত এবং শোণ নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। গঙ্গা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাব্য নদী।

ব্রহ্মপুত্র—(১৬৮০ মাইল) ইহা মানস সরোবরের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া তিব্বতের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব দিকে ৮০০ শত মাইল প্রবাহিত। এই অংশের নাম সানপু। ইহার পর দিহং নামে আসামের উত্তরে সদিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে; এখান হইতে পশ্চিমে গাড়ো পাহাড়ের পাশ দিয়া ইহা ব্রহ্মপুত্র নামে এবং বঙ্গদেশে যমুনা নামে প্রবেশ করিয়াছে। পরে পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ইহার গতিপথে অনেক বালিচড়া ও দ্বীপ আছে। ব্রহ্মপুত্রের বৃহদাংশ তিব্বত ও আসামের নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। হিমালয় হইতে উৎপন্ন ডিহং, ধনশ্রী, কালাং, সঙ্কোশ, তিস্তা, ননাস, ভারেলী, ডিবাং এবং আসামের পাহাড় হইতে দিশাং, কুলসী, নয়াদিবি প্রভৃতি উপনদী ব্রহ্মপুত্রে মিশিয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের নদী

বিন্ধ্য, সাতপুরা ও পশ্চিমঘাট পর্ব্বত দক্ষিণ ভারতের প্রধান জল বিভাজিকা।

পশ্চিম বাহিনী নদী :—মহাকাল ও মহাদেব হইতে যথাক্রমে নর্ম্মদা (৮০০ মাইল) গণ্ডী, মাহে ও সবরমতী উৎপন্ন। ইহারা পশ্চিম বাহিনী হইয়া কাম্বে উপসাগরে পড়িয়াছে। ইহাদের মুখে কোন ব-দ্বীপ নাই।

বঙ্গোপসাগরে পতিত নদী :—মহানদী (৫৫০ মাইল) অমর কণ্টক পর্ব্বত এবং গোদাবরী (৯০০ মাইল) কৃষ্ণা (৮০০ মাইল) ও কাবেরী (৪৭৫ মাইল) পশ্চিমঘাট পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন এবং পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটির মোহনায় উর্ব্বর ও বসতিপূর্ণ ব-দ্বীপ আছে।

মহানদী—মধ্যপ্রদেশ, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার ভিতর দিয়া প্রবাহিত। বৈতরণী ও ব্রাহ্মণী ইহার উপনদী। গোদাবরী বোম্বাই, হায়দরাবাদ ও মাদ্রাজের ভিতর দিয়া প্রবাহিত। ইন্দ্রবতী, প্রাণহিতা, (ওয়ার্দ্ধা ও পেলাংএর মিলিত প্রবাহ) ও মঞ্জিরা ইহার উপনদী। কৃষ্ণা নদী বোম্বাই-এর মধ্যভাগ, হায়দরাবাদের পূর্ব্ব সীমা ও মাদ্রাজের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ভীমা ও তুঙ্গভদ্রা ইহার প্রধান উপনদী। কৃষ্ণা খরস্রোতা এবং মোটেই নাব্য নহে। কাবেরী কুর্গ, মহীশূর ও মাদ্রাজের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

পেন্নার ও পালার মহীশূরের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। পশ্চিম উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া অনেক নদী সৃষ্টি হইয়াছে; তবে ইহারা খুব ক্ষুদ্র।

হ্রদ

কাশ্মীরে উলার হ্রদ; মহীশূরে বনবিলাস; রাজপুতনায় ধেবার, পুষ্কর, ও সম্বর হ্রদ আছে। সম্বর হ্রদ বর্ষাকালে ১০০ বর্গ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত

হয়। ইহার জল লবণাক্ত। কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর ব-দ্বীপের মধ্যভাগে নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত কোলার হ্রদের আয়তন ১০০ বর্গ মাইল। মহানদীর ব-দ্বীপের নিকটে মৎস্যপূর্ণ চিল্কা ও মাদ্রাজের নিকটে পুলিকট হ্রদ অবস্থিত। ইহারা সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত উপহ্রদ। বর্ষাকাল ব্যতীত ইহাদের জল লবণাক্ত থাকে।

জলবায়ু

ভারতের বিশালতার বিষয় আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই কারণে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু দেখা যায়।

অক্ষাংশ যত বাড়ে উষ্ণতা তত কম হয়। ত্রিচিনপল্লী—৮২°, বোম্বাই—৮০°, করাচী—৭৮°।

দক্ষিণাপথ গ্রীষ্মমণ্ডলে ও উত্তর ভারত নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত। শীতকালে দক্ষিণায়নের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে সূর্য্যরশ্মি অধিকতর লম্ব ভাবে পতিত হয়। এই কারণে দক্ষিণ ভারত অধিকতর উত্তপ্ত। তখন লাহোরের উষ্ণতা ৫৫ ডিগ্রী, কিন্তু মাদ্রাজের উষ্ণতা ৭৫ ডিগ্রী থাকে।

গ্রীষ্মকালে সূর্য্যের উত্তরায়ণের জন্য উত্তর ভারতের স্থলভাগ অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। দক্ষিণ ভারতে সূর্য্য-রশ্মি লম্বভাবে পতিত হইলেও ইহার অপ্রশস্ততা, সমুদ্র সান্নিধ্য ও উচ্চতার জন্য উষ্ণতা উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে অনেক কম।

বায়ু ও বৃষ্টিপাত

(ক) গ্রীষ্মকালে উত্তর ভারত অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব্ব আয়ণ বায়ু নিরক্ষ রেখা অতিক্রম করিয়া আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপর

দিয়া আর্দ্র দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুরূপে উত্তর ভারতের নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। এই বায়ু প্রবাহের প্রধান অংশ আরব সাগরের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার কালে পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতে বাধা পাইয়া মালবার উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত (১০০ ইঞ্চি) করে। পশ্চিমঘাট অতিক্রম করিলে উক্ত বায়ুতে জলীয় বাষ্প কমিয়া যায় এবং নীচে নামিবার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ হয়। অধিকন্তু মালভূমিতে উচ্চ পর্ব্বত না থাকায় তথায় বৃষ্টিপাত হয় না। সেই জন্য মালভূমি বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল। কেবল পালঘাটের সঙ্কীর্ণ ১৬ মাইল ফাঁক দিয়া এই বায়ু প্রবাহিত হইয়া মালভূমিতে বৃষ্টি জল বর্ষণ করে। ইহার বাকী অংশ বোম্বাইএর উত্তরে নর্ম্মদা ও ইহার উপত্যকা দিয়া বহিবার কালে বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্ব্বতমালায় বাধা পাইয়া প্রচুর (১০০ ইঞ্চি) বৃষ্টিপাত করে। অপর কতক অংশ ভারতের উত্তর-পশ্চিম উপকূলের কাথিয়াবাড় উপদ্বীপ ও করাচীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল দিয়া প্রবেশ করিয়া সিন্ধু ও পাঞ্জাবের সমভূমি এবং মরুভূমির উপর উপর দিয়া অবাধে বহিয়া ডান দিক বাঁকিয়া অগ্রসর হয় এবং হিমালয়ে প্রতিহত হইয়া তথায় বারি বর্ষণ করে। এই বায়ুর কতক অংশ আসাম পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। উত্তর-পশ্চিমের মরুভূমিতে ও সমভূমিতে আর্দ্র মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হইলেও অত্যধিক উত্তাপ ও পর্ব্বতের অভাবে বৃষ্টিপাত হয় না। শুধু আরাবল্লী পর্ব্বতে বাধা পাইয়া রাজপুতনার পূর্ব্বাংশে বৃষ্টিপাত (৬০ ইঞ্চি) করে।

এই সময়ে বঙ্গোপসাগর শাখা প্রথমে আরাকান পর্ব্বতে প্রতিহত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের উপর দিয়া আসিয়া আরব সাগর শাখার সহিত মিলিত হয়। এই দুই শাখার মিলনের ফলে আসামের ও হিমালয়ের পর্ব্বতমালায় প্রচুর বৃষ্টিপাত (১০০।২০০ ইঞ্চি) ঘটায়। খাসিয়া পাহাড়ের চেরাপুঞ্জীতে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টিপাত (৫০০ ইঞ্চি) হয়। কিন্তু চেরাপুঞ্জীর অপর দিকের শিলংএ মোট ৮২ ইঞ্চি বারিপাত হয়। এই

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু গড় বৃষ্টিপাতের শতকরা ৯০ ভাগ বৃষ্টি দান করে।

(খ) শীতকালে উত্তর এশিয়া হইতে শীতল ও শুষ্ক উত্তর-পূর্ব্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। কিন্তু ইহা হিমালয়ে বাধা প্রাপ্ত হইবার ফলে ভারত কঠোর শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পায়। ইহার সামান্য শুষ্ক অংশ হিমালয়ের তুষার রাশি অতিক্রমের সময় কিয়ৎ পরিমাণ বাষ্প শোষণ করে এবং পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের উত্তরে পার্ব্বত্য অঞ্চলে শীতকালে অল্প পরিমাণ বারিপাত করে। ইহার যে অংশ বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া বহিয়া যায় তাহা কর্ণাট উপকূলে বৃষ্টি দেয়। শীতের মৌসুমী বায়ু ভারতে শতকরা ১০ ভাগ বারিপাত ঘটায়।

বারিপাতের তারতম্য অনুসারে ভারতকে চারিভাগে বিভক্ত করা যায়।

(১) প্রচুর বারিপাত ৮০ ইঞ্চির বেশী—পশ্চিম উপকূল, হিমালয়ের পূর্ব্বাংশ ও আসাম।

(২) মধ্য বারিপাত—(৪০ হইতে ৮০ ইঞ্চি) বাঙলা, বিহার, যুক্ত প্রদেশ, উত্তর-পূর্ব্ব মালভূমি, বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্ব্বত, পূর্ব্বঘাট অঞ্চল ও তড়াই অঞ্চল।

(৩) স্বল্প বারিপাত ; (২০ হইতে ৪০ ইঞ্চি) কর্ণাট বা দক্ষিণাপথের দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশ, পাঞ্জাবের সমভূমি।

(৪) শুষ্ক মরু প্রকৃতির অঞ্চল (২০ ইঞ্চির নীচে) বেলুচিস্থান, পশ্চিম রাজপুতনা, পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশের দক্ষিণাংশ। কাশ্মীরে বৃষ্টিপাত হয় না বলিলেই চলে।

ঝড়

বিপরীত মুখী শীত-মৌসুমী ও গ্রীষ্ম-মৌসুমী বায়ুর সংঘর্ষে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে একবার এবং আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে আর একবার ভীষণ

ঝড় হয়। প্রথম ঝড়কে বাঙলা দেশে কাল-বৈশাখী এবং দ্বিতীয় ঝড়কে আশ্বিনে-ঝড় বলা হয়।

অতএব ভারতে মুখ্যত তিনটি ঋতু বর্ত্তমান।

(১) নাতিশীতোষ্ণ ও শুষ্ক শীতকাল (নবেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী)

(২) শুষ্ক অত্যুষ্ণ গ্রীষ্মকাল (মার্চ্চ হইতে জুন)

(৩) আর্দ্র ও কম উষ্ণ বর্ষাকাল (জুলাই হইতে অক্টোবর)।

ভারত মহাসাগর

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ প্রান্তে ভারত মহাসাগর অবস্থিত। ভারত মহাসাগরের সীমান্ত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অংশে সীমাবদ্ধ নহে—ইহা দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

সীমা—উত্তরে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান এবং পারস্য, দক্ষিণে—আইলাণ্টকার উত্তর প্রান্ত। পশ্চিমে—আরব ও আফ্রিকা পূর্ব্বে—মালয়, সিঙ্গাপুর, শুণ্ডা দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া। দক্ষিণ অক্ষাংশের ৩৫ ডিগ্রী হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে কোন প্রাকৃতিক সীমারেখা নাই। পশ্চিমে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত এবং পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া এই দুই বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী অংশেই ভারত মহাসাগরের বিস্তার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (১০, ০০০ কিলোমিটার) অর্থাৎ ৫,৫০০ সামুদ্রিক মাইল। এই সীমারেখা হইতে ভারত মহাসাগর উত্তর দিকে ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ভারতের উপদ্বীপ অংশ দ্বারা দ্বিধা বিভক্ত। ইহার পূর্ব্বাংশ বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমাংশ আরব সাগর নামে পরিচিত। এডেন হইতে সমুদ্রপথে পেনাংএর (মালয় উপদ্বীপ) দূরত্ব ৬,১০০ কিলোমিটার অর্থাৎ ৩,৩০০ সামুদ্রিক মাইল। বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর ঠিক কর্কট ক্রান্তিতে এশিয়ার স্থলভাগের সহিত মিলিত হইয়াছে। আরব

সাগর, লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগর যথাক্রমে বাবেল মাণ্ডেব ও অরমজ প্রণালীর দ্বারা যুক্ত। উল্লিখিত সাগরদ্বয় আবার উত্তর-পশ্চিম দিকে ৩০° পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই চতুঃসীমার মধ্যে ভারত মহাসাগরের আয়তন প্রায় ৭৪,৯১৭,০০০ বর্গ মাইল। ভূমণ্ডলের তিনটি প্রধান জলভাগের মধ্যে ইহা ক্ষুদ্রতম অর্থাৎ মোট আয়তনের ২০·৭ শতকরা ভাগ মাত্র। অতলান্তিক ২৯·৬ ভাগ এবং প্রশান্ত মহাসাগর প্রায় অর্দ্ধেক অর্থাৎ ৪৯·৭ ভাগ।

ভৌগোলিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, ভারত মহাসাগর সমগ্রভাবে উষ্ণমণ্ডলে নহে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাণিজ্য-পোতগুলি উষ্ণমণ্ডলীয় অংশের ভিতর দিয়া আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ উপকূল ধরিয়া চলাচল করে বলিয়া উক্ত অঞ্চলকে উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। উত্তরে ৩৪,২৮০,০০০ বর্গমাইল উষ্ণমণ্ডলে এবং দক্ষিণ ভাগে ৪০,৬৩৭,০০০ বর্গ মাইল উষ্ণমণ্ডলের বহির্ভাগে অবস্থিত। লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরকে ইহার অন্তর্ভুক্ত ধরা যায়। লোহিত সাগরের আয়তন—৪৩৭,৯০০ বর্গ মাইল এবং পারস্য উপসাগর ২৩৮,৮০০ বর্গমাইল।

নদ-নদী

ভারত মহাসাগরে পতিত বৃহৎ নদ-নদীর সংখ্যা কম। তন্মধ্যে জামবাসী, জাহাত এল, আরব, সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও ইরাবতী প্রধান।

ভারত মহাসাগর উষ্ণমণ্ডলের পূর্ব্ব অংশে অবস্থিত এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয় বলিয়া এখানে প্রচুর বারিপাত হয়। স্থলভাগের প্রচুর জলরাশি নদীপথে মহাসাগরের জলে প্রবাহিত হয় বলিয়া সমুদ্র জলের মধ্যে লবণাংশ কম—বিশেষ করিয়া বঙ্গোপসাগরের জলে লবণের অংশ খুবই কম পরিলক্ষিত হয়।

সমুদ্রতলের আকৃতি

ভারত মহাসাগরের তলদেশের বহু অংশ অদ্যাবধি অজ্ঞাত।

H. M. S, Challengerএর Sounding, জার্ম্মাণ জাহাজ Gazelle-এর পর্য্যবেক্ষণ, বহু বৃটিশ Cableship, ১৮৯৮ সালে জার্ম্মাণ জাহাজ 'Valdivia' এবং ১৯০৫ সালে Percy Salden Trustএর উদ্যোগে H. M. S. 'Sealark' জাহাজ কর্ত্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি বহু মূল্যবান। উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে সমুদ্রে নিমজ্জিত একটি শৈলশিরা বিদ্যমান। ইহা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় দুই হাজার ফ্যাদম নীচে অবস্থিত। উক্ত শৈলশিরার উপর Crozet Island, Kerguelen অবস্থিত। ৯০ ডিগ্রীতে Kaiser Wilhelmland (Gaussberg) এর সন্নিহিত অঞ্চলে ইহা Antarctic-এর সমুদ্রতলস্থ মালভূমির সহিত সরাসরি ভাবে যুক্ত। এই স্থান হইতে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ অংশ পর্য্যন্ত একটি গভীর খাদ বিদ্যমান; ইহার গভীরতা ২,৭৫০ ফ্যাদমের বেশী। উক্ত খাদ উত্তর দিকে উত্তর-পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া ও শুণ্ডা দ্বীপপুঞ্জের প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

এই অঞ্চলের সমুদ্রতল একটু অদ্ভুত আকৃতির। সুমাত্রার পশ্চিম উপকূল এবং জাভার দক্ষিণ উপকূল বরাবর দুইটি দীর্ঘ অথচ সঙ্কীর্ণ অঞ্চল সমান্তরালভাবে অবস্থিত এবং ইহাদের গভীরতা গভীর সমুদ্রের অনুরূপ। উপকূল ভাগ হইতে সর্ব্বাধিক নিকটবর্ত্তী সুমাত্রা ও মেন্তাওয়ে দ্বীপপুঞ্জের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে ইহার গভীরতা ৮০০ ফ্যাদম এবং জাভার দক্ষিণ ভাগে ১,৫০০ হইতে ২০০০ ফ্যাদম। ইহার পরই একটি জলমগ্ন শৈলশিরা আছে। মেন্তাওয়ে দ্বীপের পশ্চিম ভাগে অপর একটি খাদ রহিয়াছে। ইহার গভীরতা ২,৫০০ ফ্যাদমের বেশী। জাভা হইতে ২৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে ইহার গভীরতা ৩,৫০০০ ফ্যাদম। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সমুদ্রতলস্থ ঐ সমস্ত শৈলশিখর পরস্পর সমান্তরাল

ভাবে অবস্থিত। শুণ্ডা দ্বীপপুঞ্জের পর্ব্বতমালার সহিতও ইহারা সমান্তরাল। ১৯২৪ সালে একখানি ওলন্দাজ সাবমেরিন Echo Sounding যন্ত্র সাহায্যে Christmas দ্বীপপুঞ্জের উত্তর-পূর্ব্ব অঞ্চলে ৩,৫০০ ফ্যাদমের বেশী গভীরতা পরিমাপ করিতে সমর্থ হয়। মালয় উপদ্বীপ, আফ্রিকা ও মাদাগাস্কার অঞ্চলে সমুদ্রের গভীরতা ঐরূপ নহে।

ভারত মহাসাগরের পশ্চিম অংশে লাক্ষাদ্বীপ, মালদ্বীপ, ছাগোস দ্বীপপুঞ্জের ডিগোগারসিয়া পর্য্যন্ত দ্বীপগুলি একই শৈলশিরার উপর অবস্থিত। সেসেলিস দ্বীপশ্রেণী, সায়-ডি-মালাব্যাঙ্ক ও নাজেরেথ-ব্যাঙ্ক সহ মাউরিটাস দ্বীপগুলি অপর একটি শৈলশিরার উপর অবস্থিত। শেষোক্ত শৈলশিরা অঞ্চলের সমুদ্র ৫০০ ফ্যাদমের অধিক গভীর নহে। মাদাগাস্কার দ্বীপের জলনিমগ্ন একটি অংশ দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত এবং সমুদ্রতলস্থ একটি মালভূমির দ্বারা আফ্রিকার সহিত সংযুক্ত। এই মালভূমি অঞ্চলে সমুদ্রের গভীরতা ১,৫০০ ফ্যাদমের কম।

পারস্য উপসাগর অগভীর এবং গড়ে গভীরতা মাত্র ১৩ ফ্যাদম। লোহিত সাগরের কোন কোন অংশ ১,০০০ ফ্যাদম গভীর।

দ্বীপ

প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় ভারত মহাসাগরের পূর্ব্বাঞ্চল অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলে দ্বীপের সংখ্যা বেশী। প্রায় মধ্যভাগে মালদ্বীপ, ছাগোস ও কুকুস দ্বীপগুলি প্রবাল দ্বীপমালা। মাউরিটাস, ক্রোজেট দ্বীপ শ্রেণী ও সেণ্টপল দ্বীপমালা Volcanic Island, মাদাগাস্কার, সোকোত্রা ও সিংহল স্বাভাবিক দ্বীপ। ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ অংশের প্রায় মধ্যভাগে জনবসতিহীন প্রত্যন্ত কারগুয়েলীন দ্বীপ অবস্থিত। আণ্টাটিকে অভিযান চালাইবার ক্ষেত্রে ইহাকে গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি স্বরূপ ব্যবহার করা চলে।

সমুদ্রতলের মাটি

বঙ্গোপসাগরের মধ্যভাগের সঙ্কীর্ণ অঞ্চল ব্যতীত আরব সাগর ও লোহিত সাগরের উত্তর ভাগ; পারস্য উপসাগর এবং ভারত মহাসাগরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূল ভাগের সঙ্কীর্ণ অংশের তল-মৃত্তিকা মুখ্যতঃ নীল ও সবুজ। আফ্রিকার উপকূল ভাগ ছাড়াইলে সমুদ্রতলের বিরাট অংশে Glauconitic sands ও কাদা রহিয়াছে। এই অংশের গভীরতা ১ হাজার ফ্যাদমের বেশী। সমুদ্র-তীরবর্ত্তী অঞ্চলে প্রবাল দ্বীপমালা আছে। ভারত মহাসাগরের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশের গভীর তলভাগ Globigerina ooze-এ আবৃত। শুধু সোকোত্রা হইতে মালদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও অপেক্ষাকৃত একটি উচ্চ অংশে Red clay'র পাতলা আস্তরণ পরিদৃষ্ট হয়। এই অঞ্চলটি প্রায় সমচতুষ্কোণ। ইহার পূর্ব্ব ভাগের দুই দিকে শুণ্ডা দ্বীপমালা এবং অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চল অবস্থিত। অষ্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ ভাগে উক্ত সমচতুষ্কোণের প্রান্ত হইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দুইটি অংশ প্রায় মাদাগাস্কার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উত্তর ভাগে Christmas দ্বীপ এবং কুকুস দ্বীপের দক্ষিণ ভাগে Red clay নাই। বিরাট অঞ্চল জুড়িয়া Radiolarian ooze রহিয়াছে। ৫০ ডিগ্রী হইতে দক্ষিণ দিকে হিমাঞ্চল পর্য্যন্ত সমুদ্রতল মৃত্তিকা Diatomos ooze-এর Siliceous deposit দ্বারা আবৃত।

জলের উত্তাপ

Southern tropics-এর উত্তরে সমুদ্র পৃষ্ঠের জলের উষ্ণতা প্রায় ২০ ডিগ্রী এবং Equatorial latitude এ ২৫ ডিগ্রীর উর্দ্ধে থাকে। পূর্ব্ব অংশের সাধারণ উষ্ণতা ২৭·৫ ডিগ্রীর উর্দ্ধে। লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরে সমুদ্র জলের উষ্ণতা প্রায়ই ৩০ ডিগ্রীর উর্দ্ধে উঠে।

৪০ ডিগ্রী দক্ষিণ ভাগে কারগুলেনের ৪৯ ডিগ্রী সন্নিকটস্থ অঞ্চলে জলের উত্তাপ দ্রুত হ্রাস পায়। গ্রীষ্মকালেও উক্ত অঞ্চলে উত্তাপ ২ ডিগ্রী অথবা ৩ ডিগ্রীর ঊর্দ্ধে উঠে না। Isotherms মুখ্যতঃ পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হয় এবং অতলান্তিকের ন্যায় স্রোতধারার প্রভাবে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে না। গভীর সমুদ্রের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, অতলান্তিক ও ভারত মহাসাগরের গভীর অংশের উত্তাপ অনুরূপ। ভারত মহাসাগরের ৫০ এম হইতে ৮০০০ এম অথবা ১০০ এম পর্য্যন্ত Equatorial অংশে উত্তাপ ০—১০ ডিগ্রী, ১০০০ এম-এর অধিক গভীর অংশের উত্তাপ প্রায় সমরূপ এবং সকল ঋতুতে প্রায় ৩ ডিগ্রী থাকে। ৫০০০ এম গভীর অঞ্চলের উত্তাপ ১ ডিগ্রী।

লবণাংশ

সমুদ্র জলের উপরিভাগের মধ্যে (ক) আরব সাগর এবং (খ) দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যবর্ত্তী অংশের জলরাশি বেশী লবণাক্ত। অষ্ট্রেলিয়ার সন্নিহিত অঞ্চলের জলরাশিতে লবণের অংশ সর্ব্বপেক্ষা বেশী অর্থাৎ শতকরা ৩৬ ভাগের ঊর্দ্ধে। বর্ষাকালে সুমাত্রার পশ্চিম দিকে এবং সমগ্র বঙ্গোপসাগরে বারিপাত ও নদী প্রবাহ সমুদ্র জলে অধিক পরিমাণ মিশ্রিত হইবার ফলে লবণাক্ততা হ্রাস পাইয়া শতকরা ৩৪ ভাগে দাঁড়ায়। হুগলী নদীর মোহনার জলে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ হইয়া যায়। অপর পক্ষে লোহিত সাগরের উত্তরাংশে জলে লবণাংশ আনুপাতিক হারে প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ হইয়া পড়ে। New Amsterdam ও Sao Paulo' এর দক্ষিণ ভাগে লবণাংশ ও উত্তাপ অতি দ্রুত হ্রাস পাইয়াছে। কারগু-য়েলেন হইতে দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ-মেরু অঞ্চলের জলরাশিতে লবণের

অংশ শতকরা ৩৩ ৭ ভাগ। ভারত মহাসাগরের গভীর অংশের অধিকাংশ অঞ্চলের জলরাশির লবণাক্ততা অতলান্তিকের অনুরূপ। এই কারণে সমুদ্রের জলধারার স্তর সমূহ অতলান্তিকের ন্যায় বলা চলে। জলধারার বিভিন্ন স্তরে আড়াআড়ি ভাবে উত্তর হইতে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে স্রোতধারা প্রবাহিত হয়।

আবহাওয়া

সমগ্র ভারত মহাসাগরের আবহাওয়া অতি নিয়মিতরূপে ষাণ্মাসিক ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। বিশেষ করিয়া মনসুন এলাকায় (১০°৪ উত্তর দিকে) বায়ুর প্রভাব অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীর অপর কোন অংশের জলভাগে এইরূপ অবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। অক্টোবর-নবেম্বর হইতে মার্চ্চ-এপ্রিল পর্য্যন্ত উত্তর-পূর্ব্ব বায়ু উত্তর অক্ষাংশে এবং উত্তর-পশ্চিম বায়ু দক্ষিণ অক্ষাংশে প্রবাহিত হয়। মে-জুন হইতে সেপ্টম্বর-অক্টোবর পর্য্যন্ত দক্ষিণ—দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হয়। আরব সাগরে সোকুত্রা ও মাল দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে উল্লিখিত দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ইহা এত প্রচণ্ড যে আধুনিক বাষ্পীয়পোত চলাচলের পক্ষেও অত্যন্ত বিপজ্জনক। অতি প্রাচীনকালে হইতে উল্লিখিত বায়ু-প্রবাহের সুযোগে পালচালিত নৌকাগুলি ভারত—আফ্রিকা চলাচল করে। দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু প্রবাহ সমগ্র ভারতে বারিপাত ঘটায়। উত্তর-পূর্ব্ব মৌসুমী বায়ু অনেকটা শুষ্ক। দক্ষিণ দিকে সেসেলিস, ছাগোস ও কুকুস দ্বীপের অক্ষাংশে দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাণিজ্য বায়ু প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ ভাগে ৩০°S পশ্চিমা-বায়ুর গতি প্রবল—বিশেষ করিয়া ৪০ হইতে ৫০ ডিগ্রী অক্ষাংশে উল্লিখিত বায়ু-বেগ বিশেষ প্রবল। ১৯শ শতাব্দীতে পালচালিত দ্রুতগামী জাহাজগুলি উক্ত বায়ু-প্রবাহের সুযোগে অষ্ট্রেলিয়া ও চীন গমন করিত।

উষ্ণ-মণ্ডলের ঝড় বিশেষ করিয়া মাউরিটাস অঞ্চলের ঝড় অত্যন্ত প্রচণ্ড। ইহা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে প্রবাহিত হইয়া দক্ষিণমুখী এবং পুনরায় দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে ধাবিত হয়। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে ইহার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে উল্লিখিত ঝড়ের প্রকোপ অল্প। বৎসরে দুই এক বার এই ঝড় দেখা যায়। মৌসুমী বায়ু পরিবর্ত্তন অর্থাৎ এপ্রিল-মে এবং অক্টোবর-নবেম্বর মাসে ইহার প্রকোপ পরিলক্ষিত হয়। কলিকাতার সন্নিহিত হুগলী নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে প্রচণ্ড ঝড় সহ উত্তাল তরঙ্গ নৌ-চলাচলের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই ঝড়ে হাজার হাজার নরনারী প্রাণ হারাইয়াছেন।

স্রোতধারা

ঊর্দ্ধ স্তরের জলস্রোত বায়ুর গতি দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং উষ্ণ মণ্ডলে ইহা মৌসুমী বায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু উক্ত অঞ্চলে উত্তর-পূর্ব্ব ও পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হয়। **Florida**র **Gulf Stream**-এর ন্যায় এই অঞ্চলে উল্লিখিত বায়ু-প্রবাহের বিপরীত দিকে ২৪ ঘণ্টায় জাহাজ ৬০ হইতে ১০০ সামুদ্রিক মাইল চালাইয়া যাওয়া সম্ভব। উত্তর-পূর্ব্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহের কালে উত্তর অক্ষাংশে ভারত মহাসাগরের জল পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। বিষুব-রেখা ও ১০°Sএর মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রে একটি বিপরীত স্রোতধারা পূর্ব্বদিকে পশ্চিম সুমাত্রার দিকে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাণিজ্য বায়ুর প্রভাবে বিষুব রেখার দক্ষিণ অংশের স্রোতধারা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয় এবং মাদাগাস্কারে Cape Amberএ পৌছিয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়ে।

উত্তর দিকে প্রবাহিত স্রোতধারা আফ্রিকার উপকূল পর্য্যন্ত

পৌঁছিয়া Mozambique চ্যানেলের ভিতর দিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় এবং পরে দক্ষিণ আফ্রিকা উপকূলের বিখ্যাত Agulhas স্রোতধারারূপে পরিণত হয়। অপর অংশ Mascarene স্রোতধারারূপে মাদাগাস্কারের পূর্ব্ব উপকূল ব্যাপিয়া প্রবাহিত হইয়া ক্রমশঃ দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে ধাবিত হয়। Agulhus প্রবাহ Agulhus bankএর Ridgeএ সন্নিহিত অঞ্চল দিয়া অতি দ্রুতবেগে পশ্চিম দিকে ছুটিয়া যায়। কিন্তু বায়ু প্রবাহ তরঙ্গ প্রবাহকে পূর্ব্বদিকে পরিচালিত করে বলিয়া সমুদ্র জলস্রোত অত্যন্ত বেয়াড়া আকার ধারণ করে।

উত্তমাশা অন্তরীপের দক্ষিণ ভাগ বাহিয়া Agulhas স্রোতধারা দক্ষিণ সমুদ্র হইতে পশ্চিমা বায়ু তাড়িত স্রোতধারার সহিত মিলিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রের স্রোত প্রবল পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে প্রবাহিত হয়। সাধারণতঃ এই বায়ু প্রবাহে চালিত স্রোতধারার উত্তাপ কম। তবে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে উল্লিখিত মিলিত স্রোতধারা পূর্ব্বদিকে প্রায় Kerguelen পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। উল্লিখিত পশ্চিমা বায়ু একটি স্রোতধারাকে অষ্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূল বরাবর উত্তরে উত্তর-পশ্চিম দিকে চালিত করে। সুতরাং পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ায় শীতল জলীয় উপকূল জলধারার অভাব পরিদৃষ্ট হয়। আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল ভাগে যেরূপ কুয়াসা দেখা যায়, প্রথমোক্ত অঞ্চলে তাহা নাই।

ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ মেরু অঞ্চল হইতে শীতল জলীয় একটি প্রশস্ত স্রোতধারা উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ধাবিত হয়। এই স্রোতধারার সহিত বহু সংখ্যক তুষারশৈল Prince Edward Island, Crozet Island ও Kerguelen পর্য্যন্ত ভাসিয়া আসে। অনেক সময় ঐ সমস্ত তুষারশৈল দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার জাহাজ চলাচল পথ পর্য্যন্ত পৌঁছায়।

পথ-ঘাট

ভারতে পাকা রাস্তার মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৬ হাজার মাইল। ইহা ব্যতীত প্রাদেশিক সরকারের অধীনে হাজার হাজার মাইল কাঁচা রাজপথ ও সড়ক আছে। নূতন বহু রাজপথ নির্ম্মাণ এবং পুরাতন রাজপথ ও সড়ক গুলির দ্রুত উন্নয়ন প্রয়োজন। পাকা ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলি অনেকটা সমতল। কিন্তু তাপের পরিমাণ অত্যধিক বলিয়া অধিকাংশ রাস্তা বালিতে পূর্ণ এবং বর্ষায় কর্দ্দমাক্ত হইয়া পড়ে। ক্যাণ্টনমেণ্টগুলির সন্নিহিত অঞ্চলে মেরামতি কার্য্য ভাল চলিলেও দূরবর্ত্তী অঞ্চলের অবস্থা শোচনীয়।

ভারতে তিনটি গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড আছে। ঐতিহাসিক ও সামরিক দিক হইতে ইহাদের গুরুত্ব অত্যধিক।

(১) মাদ্রাজ হইতে বাঙ্গালোর, বেলগাঁ, পুনা, কল্যাণ (বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী) মো, ইন্দোর, গোয়ালিয়র ও আগ্রা হইয়া দিল্লী পৌছিয়াছে।

(২) কলিকাতা হইতে কাশী, এলাহাবাদ, কানপুর হইয়া দিল্লী পৌছিয়াছে; এবং সেখান হইতে আম্বালা, লাহোর ও রাওলপিণ্ডী হইয়া পেশোয়ার পৌছিয়াছে।

(৩) মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা পৌছিয়াছে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ব্যতীত অপর প্রায় সমস্ত ক্যাণ্টনমেণ্ট উল্লিখিত প্রধান রাজপথ গুলির সন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থিত।

রেলপথ

ভারতে গবর্ণমেণ্ট ও গবর্ণমেণ্ট নিয়ন্ত্রিত মোট রেলপথ প্রায় ৪২ হাজার মাইল দীর্ঘ। তন্মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড গজ অর্থাৎ ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। ১৭৫০০ মাইল রেলপথ মিটার গজ। অবশিষ্ট রেলপথ

গুলি ২ ফুট ৬ ইঞ্চি অথবা ২ ফুট। ভ্রমণের দিক হইতে ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি রেলপথ ভারতের ন্যায় বিরাট দেশে আরামপ্রদ হইলেও সামরিক দিক হইতে কতক অসুবিধা বিদ্যমান, অর্থাৎ অর্ডার ব্যতীত জরুরী অবস্থায় একমাত্র স্পেন ছাড়া অপর কোন দেশ হইতে গাড়ী পাওয়া সম্ভব নহে।

সামরিক দিক হইতে রেলপথ মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ। সর্ব্বাধিক উল্লেখ-যোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধা এই যে প্রায়ই ব্রড গজ হইতে মিটার গজ অথবা ন্যারো গজে গাড়ী বদলাইতে হয়। ইহাতে পণ্য, সামরিক দ্রব্য ও সাজসরঞ্জাম একটানা স্থানান্তর সম্ভব নহে। যুদ্ধ অথবা কোনরূপ ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইলে মাল বোঝাই, খালাস, তত্ত্বাবধান ইত্যাদি কাজের জন্য বহু লোকের প্রয়োজন হইবে। সময়ের দিক হইতে কিরূপ অসুবিধা বিদ্যমান, তাহা অতি সহজেই অনুমেয়। যে সকল ষ্টেশনে বিভিন্ন গজের রেলপথের সংযোগ ঘটিয়াছে, সেই সকল ষ্টেশনেই সর্ব্বাপেক্ষা অসুবিধা সৃষ্টি হইবে। বহু বড় বড় নদীর উপর রেলওয়ে সেতু নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

—:※:—

দেশরক্ষার দায়িত্ব

মানুষ সামাজিক জীব। মানবগোষ্ঠির আদিমতম অবস্থার যে সকল নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা যে কোন দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার বিশ্লেষণ করিলে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, ধরিত্রীর সীমাহীন বুকে নর অথবা নারী একক, স্বাধীন, বেপরোয়া ও স্বতন্ত্র জীবন যাপন করিতেন না। তাঁহারা দলবদ্ধভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। এক পূর্ব্বপুরুষ অর্থাৎ রক্তের সম্বন্ধের ভিত্তিতে উল্লিখিত দল গড়িয়া উঠিত। সঙ্ঘবদ্ধতা, ঐক্য ও গভীর সহনশীলতা দলীয় জীবনের সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই সম্পর্কে W. R. Smith, The Religion of the Semites পুস্তকে লিখিয়াছেনঃ—"The members of kindred looked on themselves as one living whole, a single animated mass of blood, flesh, and bones, of which no member could be touched without all the members suffering........If one of the clan has been murdered, they say 'our blood has been shed." ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায়, বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য নরনারীর সামাজিক ও রাষ্ট্রীক জীবন দূরের কথা, পারিবারিক জীবনে স্নেহ, ভালবাসা, সহনশীলতা, ঐক্য সর্ব্বোপরি আনুগত্য ও নিষ্ঠার যে ভাব বিদ্যমান, তাহা অপেক্ষা আদিম দলীয় জীবনে উহা শত সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ ছিল।

উল্লিখিত গভীর ঐক্য কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা অনুধাবন করিলে দেখা যায়, দলীয় জীবন যাপনে অভ্যস্ত শিশু-মানবদের বাঁচিয়া থাকিবার পক্ষে অপরিহার্য্য প্রয়োজন বোধে ইহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত ভাবে আত্ম-

প্রকাশ করিয়া পূর্ণ অবয়ব লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বকল্পিত ব্যবস্থানুযায়ী আইন প্রণয়ন করিয়া অনিচ্ছুক ও অবাধ্য নরনারীকে ঐরূপ নীতি অনুসরণ ও মনোভাব পোষণে বাধ্য করা হইত না। এই ভাবে গঠিত ও পরিচালিত দলবদ্ধ নরনারীর স্বার্থ ও অধিকার সম্পর্কিত বিষয় বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া Dewey and Tufts Ethics পুস্তকে The Aryan household গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, "The land belonged to the clan, and the clan was settled upon the land. A man was thus not a member of the clan, because he lived upon, or even owned, the land; but he lived upon the land, and had interest in it, because he was a member of the clan."

ইহারই ভিত্তিতে দলের অন্যতম সদস্য হিসাবে ব্যক্তির যাবতীয় অধিকার নির্দ্ধারিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিত। দলবহির্ভূত নরনারীর কোনরূপ অধিকার ছিল না এবং ইহা স্বীকৃত হইত না। বহিরাগত অর্থাৎ দল বহির্ভূত নরনারী অতিথি হিসাবে সদয় ব্যবহার পাইতেন বটে; কিন্তু ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার দাবী করিবার অধিকার তাঁহার থাকিত না। ইহার সরল অর্থ এই যে, দলভুক্ত নরনারী হিসাবেই ব্যক্তির যাবতীয় অধিকার নির্দ্ধারিত ও স্বীকৃত হইত। দল বহির্ভূত অথবা দলচ্যুত হইলে ব্যক্তি বন্য পশুর ন্যায় গণ্য হইত এবং দলের উপর তাঁহার যাবতীয় অধিকার, দাবী লোপ পাইত। এই সম্পর্কে Hobhouse :—Morals in Evolution পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"Compare the story of Cain, the murderer of his brother, Abel. Jehovah punished Cain for his deed by separating him from his group and making of him a 'fugitive and vagabond' in the earth. "And

Cain said unto Jehovah, My punishment is greater than I can bear. Behold, Thou hast driven me out this day from the face of the earth; and from thy face shall I be hid; and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth; and it shall come to pass, that every one that findeth me shall slay me. (Genesis, Chapter IV. Verses 13. 14.)

দলীয় জীবনের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহাদের যাবতীয় দায়িত্ব সমষ্টিগত ছিল। ব্যক্তি বিশেষ ভিন্ন দলের প্রতি অথবা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ন্যায় অথবা অন্যায় ব্যবহার করিলে উহা দলীয় কার্য্য বলিয়া গণ্য হইত। সেই কারণে যে কোন শ্রেণীর ব্যবস্থা অবলম্বন দলীয় ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হইত। Dewey and Tufts, Ethics পুস্তকে লিখিয়াছেন :—"If some member of a savage tribe assaults a citizen of one of the civilized nations, the injured party invokes the help of his government. A demand is usually made that the guilty party be delivered up for trial and punishment. If he is not forthcoming a 'punitive expedition' is organised against the whole tribe; guilty and innocent suffer alike; or in lieu of exterminating the offending tribe, in part or completely, the nation of the injured man may accept an indemnity in money or land from the offender's tribe. Recent dealings between British and Africans, Germans and Africans, France and Morocco, the United States and the Filipinos, the Powers and

China illustrate this: The State protects its own members against other States and avenges upon the other States. Each opposes a united body to the other.

The punitive expedition into Mexico by troops of the United States Army recently carried out (1916) to avenge a foray across the border illustrates essentially the same principle.

রক্তের সম্বন্ধের ভিত্তিতে গঠিত ও পরিচালিত দলীয় জীবন যাপনে অভ্যস্ত শিশু-মানব দলগুলি নৈসর্গিক অনৈসর্গিক নানারূপ বিবর্ত্তন, বিপর্য্যয় ও সংঘাতের ভিতর দিয়া নানা মতবাদকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমানে বিরাট বিরাট জাতি ও রাষ্ট্র শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আদিম নরনারীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য দলের শত সহস্র বৎসরের সাধনার ভিতর দিয়াই বর্ত্তমান জগতের সুসভ্য ও বিরাট জাতিগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐক্য ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হইবার অনিবার্য্য ও প্রচ্ছন্ন কারণ সমূহের মধ্যে (১) অর্থ নৈতিক অর্থাৎ মৎস্য ও বন্য পশু পক্ষী শিকার দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহে রত আদিম নরনারীর সন্তানসন্ততিগণের মধ্যে কৃষি ও বাণিজ্যের বিস্তার, (২) মনস্তাত্বিক অর্থাৎ যৌন তৃষা, সম্মান অর্জ্জন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি লাভ, স্বাধীনতা ইত্যাদি, (৩) বুদ্ধিবৃত্তির প্রসার অর্থাৎ মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার স্পৃহা, আবিষ্কার, নূতন আদর্শ ও মতবাদ গঠন ইত্যাদি। (৪) ধর্ম্ম, ঈশ্বরবাদ, এবং তাঁহার সান্নিধ্যলাভের জন্য ক্রিয়াকাণ্ড, জপতপ। (৫) যুদ্ধ বিগ্রহ।

উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রভাব অপরিমেয় হইলেও নিম্নোক্ত বিষয় দুইটি সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। (ক) ব্যক্তিত্ব বোধ এবং ইহার প্রসার। (খ) দলে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সমাজ জীবন সংগঠন ও

পরিচালনের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি। আদিম দলীয় জীবনে ব্যক্তি গৌণ এবং দলই যে মুখ্য ছিল আমরা তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ব্যক্তির অধিকার, সুযোগ সুবিধা, দাবী ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় দলের সদস্য হিসাবেই সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিত, দলহীন ব্যক্তির মূল্য ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু সমাজের উন্নতি ও বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির মূল্য ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্যক্তির পক্ষে নিজস্ব সম্পত্তি, কতক সুযোগ সুবিধা, বিশেষ অধিকার ও দাবী অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়া ব্যক্তির মূল্য ও গুরুত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিল। অপর পক্ষে দলে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ গঠন ব্যবস্থা উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। যে কতক সহজ সরল আচার, রীতিনীতি ও ঐতিহ্য দ্বারা দলীয় ব্যবস্থা পরিচালিত হইত, তাহা ক্রমাগত নানা প্রশ্ন সমস্যা সঙ্কুল হইয়া গঠন ব্যবস্থা, আচার, রীতিনীতি ইত্যাদিকে ব্যাপক ও জটিল করিয়া দিল।

এই ভাবে ব্যক্তির চিন্তা, ভাব, কার্য্য ইত্যাদিতে ব্যক্তিত্ব বোধ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বোধের জাগ্রতা যেমন সবল ও সতেজ হইয়া উঠিল, তদ্রূপ ব্যক্তির সহিত সমষ্টি অর্থাৎ দলবদ্ধ সমাজের সম্পর্ক জটিল ও অবিচ্ছেদ্য হইয়া পড়িল। সুতরাং দেখা যায়, দলে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার দাবী-মূলক প্রচেষ্টা—এই দুইটি অবিচ্ছেদ্য প্রবাহ সমাজ-প্রগতি ও উন্নতি-ধারাকে বেগবতী ও অপ্রতিহত রাখিয়াছে। প্রত্যেক দলীয় সমাজ জীবনে এই ভাবে পৃথক পৃথক ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছদ, নৈতিক ও ধর্ম্মীয় আচরণ, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক বিধান ও চিন্তাধারা বিজ্ঞান ও শিল্পনীতি দানা বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল। ইহাও সত্য যে উল্লিখিত আচার, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও প্রতিষ্ঠানগত বিষয়গুলি ব্যক্তিগত অথবা দু'চার দশ জনের পক্ষে প্রযোজ্য বিষয় নহে, সম্পূর্ণ

দলগত এবং দলীয় মনোভাব ইহার মধ্যে প্রতিফলিত। এই ক্ষেত্রে স্বতঃই একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, দলীয় মন অথবা চিন্তাধারা এবং ব্যক্তির মন ও চিন্তাধারার মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি? প্রশ্নটি বিশেষ জটিল এবং এই সম্পর্কে বহু মতবাদ বিদ্যমান। একদল মনে করেন যে, ব্যক্তির মন ও চিন্তাধারা হইতে দলীয় মন ও চিন্তাধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন এবং শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ যুক্তিযুক্ত নহে। সামাজিক আচার, রীতিনীতি, বিশ্বাস ইত্যাদি ব্যক্তির মন হইতে স্বতন্ত্র বটে কিন্তু ব্যক্তির সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্ক বর্জ্জিত, ইহাও সত্য নহে। বাস্তব পক্ষে দেখা যায় যে সকল নরনারীকে লইয়া একটি দল গঠিত তাঁহাদেরই চিন্তা, ভাব, ও কর্ম্মধারার সমষ্টিগত ফল হিসাবে উল্লিখিত বিষয়গুলি দলীয় মন রূপে অবয়ব গ্রহণ করে। সুতরাং সূক্ষ্ম বিচার কালে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, দলীয় মন বলিতে কিছু নাই। বিভিন্ন ব্যক্তির চিন্তা ও ভাব ধারার সংমিশ্রণের সমষ্টি গত ফলের মধ্যেই ইহা পরিব্যাপ্ত। ইহাতে দেখা যায়, দলীয় সমাজ জীবনের উন্নতি ও প্রগতি ব্যক্তির প্রচেষ্টার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত এবং সামাজিক মনের সহিত ব্যক্তির মনের যে দ্বন্দ্ব, বিরোধ সৃষ্টি হইয়া ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সবল ও সতেজ করিয়া তুলিত, ইহার মধ্যেই উন্নতি ও প্রগতির বীজ অন্তর্নিহিত। কিন্তু ইহাও সত্য যে, আদিম দলীয় জীবনে ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তাধারা উৎপত্তির সুযোগ ছিল না। কারণ, সমাজ জীবনের উল্লিখিত স্তরে নরনারী দলীয় চিন্তা ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত থাকিতেন। দলীয় জীবন বিস্তার লাভ করিয়া জটিল সমাজ সৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির জীবনও উন্নত হইয়া উঠিল। ইহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে দলীয় চিন্তা, ভাব ও কর্ম্ম ধারার সহিত ব্যক্তির সংঘর্ষ তীব্রতর হইতে আরম্ভ করিল।

ব্যক্তি দলীয় রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার সম্পর্কে নানারূপ প্রশ্ন উত্থাপনে সচেষ্ট হইলেন। ব্যক্তির এই ভাবে বিতর্ক উত্থাপন সম্পর্কে সমাজ তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া অধিকারগত প্রশ্ন তুলিতে লাগিল এবং ব্যক্তি ইহার পাল্টা প্রশ্ন তুলিলেন, বিতর্ক অবতারণ চলিবে না কেন? Carlyle, Heroes and Hero-worship সম্পর্কিত চতুর্থ বক্তৃতায় বলিয়াছেন:—"I do not make much of 'Progress of Species' as handled in these times of ours······Yet I may say, the fact itself seems certain enough······No man whatever believes, or can believe, exactly what his grandfather believed; He enlarges somewhat by fresh discovery, his view of the universe······It is the history of every man, and in the history of mankind we see it summed up into great historical amounts —revolutions, new epochs······So with all beliefs whatsoever in this world—all systems of beliefs and systems of practice that spring from these."

এই ভাবে রক্ষণশীল ও সংস্কারবাদীর সংগ্রাম সুরু হইল। উভয় পক্ষ নানারূপ যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া স্ব স্ব অভ্রান্ততা সপ্রমাণে সচেষ্ট। নিরপেক্ষ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, উভয় পক্ষের উক্তির মধ্যে বহু সত্য বস্তু রহিয়াছে, আধুনিক মন সেই কারণে নির্ব্বিচারে কোন পক্ষকে বাদ না দিয়া উভয়ের সংমিশ্রণে মধ্য পথ অনুসরণে ব্যগ্র। প্রচলিত রীতিনীতি ও অতীত ঐতিহ্যের ধারা অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য রক্ষণশীলদলের দাবী যেমন যুক্তিযুক্ত, তদ্রূপ স্বাধীন মন লইয়া নূতন মত ও পথের সন্ধানের জন্য সংস্কারবাদীদের বিদ্রোহ অন্যায় নহে। এক কথায়, স্থায়িত্ব রক্ষণশীলদলের কাম্য এবং প্রগতি সংস্কারবাদী দলের প্রাণবস্তু। সুতরাং দেখা যায়, স্বাধীন চিন্তা-ধারাই সমাজ জীবনের প্রাণবায়ু। ইহা ব্যতীত দল অথবা সমাজ জীবনের

উন্নতি ও প্রগতি মোটেই সম্ভব নহে। ইহাও সত্য যে, ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তাধারার অধিকার স্বীকৃত হইলে অতীত ঐতিহ্য, বিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের সহিত ইহার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। বিরোধ, বিশৃঙ্খলা ও বিপ্লবের ভয়ে কোন দল অথবা সমাজ স্বেচ্ছায় ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তাধারাকে নির্ব্বিচারে ব্যাহত করিলে সেই দল বা সমাজ স্থবিরত্ব লাভ করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে বাধ্য। ইহা আত্মহত্যার সমতুল। তবে ব্যক্তির চিন্তাধারা বাতিকগ্রস্ত ও উৎক্ষিপ্ত কিনা, সেই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। সেইরূপ অবস্থা হইলে সমাজ জীবনে গভীর অরাজকতা ও বিপর্য্যয় সৃষ্টি হইয়া ধ্বংস অনিবার্য্য। কারণ, ইহা অতীব সত্য যে, চিন্তার অবাধ অধিকারের অর্থ ভাবরাজ্যে নির্ব্বিচারে ও নির্ব্বিরোধে অরাজকতা সৃষ্টি নহে।

হাজার হাজার বৎসর প্রাচীন ও অভিজ্ঞ মানব-বিচারবুদ্ধি বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে। তন্মধ্যে একটি অতি সুন্দর ও মহান তথ্য এই যে, পরিদৃশ্যমান জড় জগতের চেতন, অচেতন, স্থূল, সূক্ষ্ম, কঠিন, তরল যাবতীয় কিছুর উপর ধ্বংসের অতি খরস্রোত একটানা গতিতে প্রবাহিত। ধ্বংসের উল্লিখিত বিপুল স্রোতাবর্ত্তকে সেই স্রোত-বাহিত উপলখণ্ড সাহায্যে প্রতিহত করিয়া সত্তা স্বীয় বৈশিষ্ট্যময় অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ ও অবিনশ্বর রাখিবার জন্য ঠিক অনুরূপ ভাবে সতেজ ও সক্রিয়। ধ্বংস ও সৃষ্টির এই অপূর্ব্ব সংঘাত অপ্রাণীজগত অপেক্ষা প্রাণী-জগতের মধ্যেই অধিকতর সুস্পষ্ট। সত্তার এই চারিত্রিক গুণ বিদ্যমান বলিয়া অবিসম্বাদিত ভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ইহাই জীবের জীবন। বাস্তব জ্ঞান হইতে আমরা দেখিতে পাই, রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধভরা এই ধরিত্রীবুকের জলে, স্থলে, নভে কত অদ্ভুত অতিকায়—কত ক্ষুদ্রকায় জীবকুল এক কালে জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রিবিধ ক্ষুধার তাড়নে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ বিচরণ কালে বীভৎস ভীমনাদে অথবা সুমধুর সঙ্গীতে

দশদিক ভরিয়া তুলিয়াছিল, ইহার ইয়ত্তা নাই। সেই সকল জীবের কোন কোন শ্রেণীর অস্তিত্বের অতি সাধারণ নিদর্শন পাওয়া যায় বটে; কিন্তু বহু শ্রেণীর জীবের বংশধর বলিতে কেহ আর আজ নাই। ধ্বংস ও সৃষ্টির প্রবল সংঘাতে সেই সকল প্রাণী চিরদিনের মত সমাহিত হইয়া গিয়াছে। আবার এককালে যাহাদের কোন চিহ্ন ছিল না, এইরূপ শত সহস্র ক্ষুদ্র, বৃহৎ, সুন্দর, কুৎসিত, দ্বিপদ চতুষ্পদ, নৃপদ ও ব্যোমচারী প্রাণী জলে-স্থলে-নভে জন্মলাভ করিয়া পুনরায় যে মৃত্যুর বুকে ঢলিয়া পড়িতেছে, ইহারও সীমা নাই। সুতরাং, আমরা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য যে, ধরিত্রীর বুকে ভবিষ্যতে যাহা কিছু বিদ্যমান থাকিবে তাহাদের অস্তিত্ব ধ্বংসের সহিত অশ্রান্ত সংগ্রামের জয়-পরাজয়ের মধ্যেই সর্ব্বতোভাবে নির্ভরশীল। এই সংগ্রামের রূপ অত্যন্ত ভয়াবহ। ইহা একান্ত ভাবে জীবন-মরণ সংগ্রাম। পরাজয়ের অর্থ মৃত্যু—ধ্বংস।

এই পরিপ্রেক্ষিতে মানবজীবন এবং জীবন-সংগ্রামের রূপ ও ধারা আরও গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, উদ্দেশ্য অথবা পরিণতি যাহাই হউক না কেন, জীবন স্থূল সত্য। ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা অথবা ইঙ্গিত থাকুক বা না থাকুক, সৃষ্টির অনবদ্য দানরূপে ইহা প্রকৃতির বুকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জীবনের অমোঘ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য এড়াইতে নরনারী সম্পূর্ণ অক্ষম। 'কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই' অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিলয়ের রূপ যাহাই হউক না কেন, জীবিত নরনারীর পক্ষে জীবন অভ্রান্ত সত্য। সুতরাং জীবনকে কর্ম্ম-স্রোতে ভাসমান রাখিয়া অবশ্যই কাজে লাগাইতে হইবে। একটী বিশেষ প্রাকৃতিক ও সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে মানুষ জন্মলাভ করেন। এই আবেষ্টনী এতই সুগঠিত ও সুন্দর যে, ইহার চাহিদা পূরণ অপরিহার্য্য। নরনারী স্ব স্ব আবেষ্টনী অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থার

সম্মুখীন হইয়া স্বতঃই কর্ম্মপ্রবণ হইয়া উঠেন। এই কারণেই স্বীকৃত হইয়াছে যে, কর্ম্মই জীবন। সুদীর্ঘ কাল গভীর পর্য্যবেক্ষণ ও বিচার-বিশ্লেষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, জীবিতকাল অর্থাৎ ব্যক্তির পরমায়ু ১২৫ বৎসরের অধিক নহে। মানুষের পক্ষে এই সময়ের সর্ব্বাঙ্গীণ দাবী পূরণ না করিবার একমাত্র উপায় আত্মহত্যা।

আমি বেঁচে আছি—এই জ্ঞান আমার মধ্যে সৃষ্টি হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝিতে পারি যে, শত সহস্র আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়াই আমার জীবন-রজ্জু গঠিত। আশা আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি স্থল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, আহার—নারী—বিশ্রাম। প্রাণী জগতের ত্রিবিধ ক্ষুধা ইহাদের মধ্যেই প্রকাশমান এবং ইহারা অবিসম্বাদিত-রূপে দৈহিক। প্রাণী খাদ্যের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল—দেহ ধারণের জন্য খাদ্য—পুষ্ট দেহের বিকাশ-প্রেরণা—যৌনতৃষা এবং উল্লিখিত দ্বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানের শ্রম অপনোদনের জন্য বিশ্রাম প্রাণী মাত্রেরই অবশ্য প্রয়োজন। প্রাণী-জগত কোন কালে কোন অবস্থাতেই উল্লিখিত ত্রিবিধ ক্ষুধার গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে নাই, অদূর ভবিষ্যতে ত' নহে, সুদূর ভবিষ্যতেও জীবন হইতে উল্লিখিত ত্রিবিধ ক্ষুধার নিবৃত্তি সম্ভব হইবে কি না, ইহার কোন সদুত্তর দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতে মানব চিন্তা ধারা অদ্যাবধি সম্পূর্ণ অক্ষম। এই সকল আশা আকাঙ্ক্ষা শত সহস্র শাখা প্রাশাখা বিস্তার করিয়া জীবনকে পল্লবিত ও মুকুলিত করে। আরও দেখা যায়, উল্লিখিত আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ অথবা প্রতিরোধের জন্য সত্তাকে অশ্রান্ত ভাবে সংগ্রাম চালাইতে হয়। প্রতিটি মুহূর্ত্তে শত সহস্র আশা অকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি ও নিবৃত্তি ঘটিতেছে। লক্ষের সমাধি বুকে কোটি জন্ম লাভ করিতেছে। একটি তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষা অপর এক অথবা একাধিক তৃষ্ণা বা আকাঙ্ক্ষা দ্বারা নিবৃত্ত অথবা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এই ভাবে তৃষ্ণা বিশেষ নিবৃত্তির দ্বারা সেই বিষয়ে

সেই মুহূর্ত্তে নির্ব্বাণ লাভ বুঝায় কি না, তাহা দার্শনিকের বিচার্য্য বিষয়। ইহা অতীব সত্য যে, ইহাকে যদি সাধন মার্গের সিদ্ধি বলিয়া গণ্য করা না হয়, তাহা হইলে মোক্ষ অথবা নির্ব্বাণ লাভের ব্যাখ্যা প্রদান সম্পূর্ণ অসম্ভব।

জীব জীবনের ত্রিবিধ ক্ষুধার অমোঘ তাড়নে তাড়িত জীব জগতের বিশিষ্ট শাখা মানব সম্প্রদায়ের একটি অংশ সমাজ জীবনের উল্লিখিত ধারা ও নীতি অনুসরণে ভারতবর্ষরূপ এই বিশাল ভূখণ্ডে বিস্তার লাভ করিয়া ভারতীয় নামে বিশ্বসমাজে স্থান লাভ করিয়াছে। ভূতত্ত্বের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, আমাদের এই দেশখণ্ড অতি প্রাচীন এবং স্মরণাতীত কাল হইতে নরনারী বিশ্বের এই অংশে বসবাস করিয়া আসিতেছেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইরূপ বিশ্বাস ও মতবাদ প্রবল ছিল যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রায় ২৫০০ অব্দে আর্য্য বলিয়া বর্ণিত এক দল বহিরাগত এদেশে আগমন করিয়া অনার্য্য বলিয়া কথিত স্থানীয় অধিবাসীদের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের দ্বারা স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁহারাই অনার্য্য ভারতের অন্ধকার বুকে আলোক-বর্ত্তিকা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন এবং ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি যাবতীয় কিছু আর্য্য ঋষি কুলের তপস্যার ফল। মহেঞ্জোদারো আবিষ্কৃত হইবার পর আর্য্যদের ভারত অভিযানের দিনক্ষণ বিচার বিশ্লেষণ করিয়া প্রমাণিত হইল যে, মহেঞ্জোদারো নির্ম্মাতা নরনারীর দল অভিযাত্রী আর্য্যগণ অপেক্ষা যাবতীয় বিষয়ে বহু গুণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন। যাহা হউক, বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং অদ্যাবধি এই সম্পর্কে গভীর গবেষণা চলিতেছে। আপাততঃ আর্য্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণে আলোচনা পরিচালন যুক্তিযুক্ত ও শ্রেয়ঃ। প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই

ভারতবর্ষ মুখ্যতঃ দুইটি অংশে বিভক্ত। উত্তরাংশ অর্থাৎ উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বতমালা, পূর্ব্বে রাজমহল পাহাড় এবং পশ্চিমে আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থানের মধ্যবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগ আর্য্যাবর্ত্ত এবং অবশিষ্ট ভারত দাক্ষিণাত্য নামে অতি প্রাচীন কাল হইতে পরিচিত। আর্য্যাবর্ত্ত এই নাম হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ইহা আর্য্যদের বাসভূমি। সেই সঙ্গে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, অবশিষ্ট অংশ আর্য্যভূমি ছিল না। এই নামকরণ কবে কাহার দ্বারা হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধারণ গভীর গবেষণা সাপেক্ষ। স্মৃতিতে আমরা পাই, "ব্রাহ্মণগণের পক্ষে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের ভিত্তিতে গঠিত ও পরিচালিত সমাজ জীবন নিরঙ্কুশভাবে যাপনের আর্য্যাবর্ত্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান।" আর্য্যদের এদেশে প্রবেশ, স্থান বিশেষ দখল ও স্থায়ী বসবাস স্থাপনের মধ্যে ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, স্থানীয় অধিবাসী অপেক্ষা সাহসিকতা সমরশক্তি ও সমরাস্ত্রের দিক হইতে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহা দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, সামরিক ক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজ জীবনের ইহাই প্রথম পরাজয়।

তারপর দেখা যায়, হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়া সিন্ধু ও গঙ্গা নামে যে দুইটী প্রধান স্রোতস্বতী ভারতভূমিকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করিয়া তুলিয়াছে, ইহাদেরই গতিপথ ধরিয়া আর্য্য সভ্যতা, সংস্কৃতি বিস্তার লাভ ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। আর্য্য সমাজ-ব্যবস্থা যে আদর্শ ও নীতিকে অবলম্বন করিয়া ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা গভীর ভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায়, জন্মান্তরবাদের অশরীরি বর্ম্মাচ্ছাদিত বর্ণাশ্রম সমাজ-বিধানের হৃদয়হীন সঙ্কীর্ণতার মধ্য দিয়া অমানবিক ও আত্মঘাতী উপায়ে শ্রেণী স্বার্থকে নিরঙ্কুশ ও শাশ্বত রাখিবার নির্লজ্জ দৈন্যতাই তন্মধ্যে অত্যধিক মাত্রায় পরিস্ফুট।

উল্লিখিত আদর্শ ও নীতি অর্থাৎ জন্মান্তরবাদ ও বর্ণাশ্রম সমাজ ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নরনারীর বংশধরগণের তরফ হইতে উল্লিখিত কঠোর অভিযোগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উত্থাপিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাঁহাদের ভ্রান্তি অপনোদনের বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার ক্ষেত্র ইহা নহে। দেশরক্ষার অর্থনৈতিক বিষয় আলোচনা কালে আমি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে ইহার যাবতীয় দিক বিশ্লেষণ করিব। চুম্বক আলোচনায় দেখা যায়, স্থানীয় অধিবাসী অনার্য্যদের উপর বহিরাগত আর্য্যদের শাসন ও শোষণ অব্যাহত ও চিরস্থায়ী রাখিবার স্বার্থান্ধ প্রেরণা লইয়াই বর্ণাশ্রম সমাজ-বিধি রচিত এবং জন্মান্তরবাদ রহস্য দ্বারা ইহাকে অকাট্য করিয়া তোলা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত কাল-প্রবাহে আর্য্য-অনার্য্যের সামাজিক বন্ধন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হইয়া বর্ণসঙ্কর সৃষ্টির ফলে কায়েমী স্বার্থের ভিত যাহাতে ধ্বসিয়া না পড়ে, বর্ণাশ্রম সমাজ-বিধির প্রতি অণুপরমাণুতে সেইরূপ সচেতনতাও অতি মাত্রায় বিদ্যমান। কিন্তু স্বার্থপরতা সর্ব্বকালে সর্ব্ব অবস্থায় অন্তর্দ্বন্দ্ব সঙ্কুল। বর্ণশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবি ও অস্ত্রজীবি-দল উল্লিখিত নীতি অনুসরণে সমাজের বৃহদংশকে বঞ্চিত করিতে সমর্থ হইলেন বটে, কিন্তু স্বার্থপরতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি রূপে ক্ষমতার মোহ উভয় পক্ষকে নির্ব্বিচারে আত্মকলহের একটানা স্রোতের মুখে ঠেলিয়া দিল।

অবশ্য শাসন ও শোষণের ক্ষমতা লাভের জন্য বর্ণশ্রেষ্ঠদ্বয়ের রেষারেষি ও সংগ্রামের কোন প্রামাণ্য বিবরণ নাই, থাকা সম্ভবও নহে। কিম্বদন্তীরূপে প্রচলিত রূপক-বহুল ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীর অতি প্রক্ষিপ্ত তথ্যাবলীর সাহায্যে বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়া Swami Sankarananda; Rigvedic culture of the Prehistoric Indus. পুস্তকে লিখিয়াছেন—

"ভারতীয় সমাজ-জীবনের শিশুকাল সত্যযুগ বলিয়া খ্যাত ছিল। সেই

যুগে সমাজবন্ধন, বিবাহ প্রথা ইত্যাদি কিছুই ছিল না। নরনারী সাহসী সত্যবাদী, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু ছিলেন। (আদিম নরনারীর এই চিত্র আমরা পূর্ব্বেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি।) সত্যযুগের শেষ ভাগে ধীরে ধীরে শ্রেণী বিভাগ দানা বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল। দলনেতৃত্বের অধিকার লইয়া বুদ্ধিজীবি ও অস্ত্রজীবির মধ্যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইল। কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়া বুদ্ধিজীবির জয় এবং অস্ত্রজীবির পরাজয় ঘোষিত হইল। এই সর্ব্বশেষ সংগ্রামের বীর হিসাবে বুদ্ধিজীবির পক্ষে পরশুরাম এবং অস্ত্রজীবিদের নেতৃত্ব পদে আমরা কার্ত্তবীর্য্যের পুত্র অর্জ্জুনকে দেখিতে পাই। এই ভাবে অস্ত্রজীবিদের পরাভবের ফলে সমাজ জীবনে বুদ্ধি-জীবিদের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নূতন সমাজ বিধান রচিত হইল। ইহাই ত্রেতাযুগের সূচনা। সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর বর্ণশ্রেষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে অনেকটা শান্তি ও সম্প্রীতির ভাব প্রতিষ্ঠিত হইল। বর্ণাশ্রম প্রথা পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় হইয়া উঠিল এবং বুদ্ধিজীবি ব্রাহ্মণগণ সমাজের নেতৃত্ব করিতে লাগিলেন। দেশ শাসনের ভার রাজা অর্থাৎ অস্ত্রজীবির উপর ন্যস্ত থাকিলেও তিনি বুদ্ধিজীবি ব্রাহ্মণের ইঙ্গিতেই পরিচালিত হইতেন। শ্রীরামচন্দ্রের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ত্রেতাযুগের অবসান ঘটিল। ইতিবৃত্তে জানা যায়, শ্রীরামচন্দ্র জলে ঝাঁপ দিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিয়া-ছিলেন এবং পৌরবাসী তাঁহাকে অনুসরণ করেন। খুব সম্ভবত এই কাহিনী বিকৃত; আসলে অপর কোন শক্তির আক্রমণে সমগ্র নগরী বিধ্বস্ত ও নগরবাসী নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল।

"দ্বাপর যুগ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থার প্রভূত পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। অস্ত্রজীবি ক্ষত্রিয় দল রাজ্যভার ও সমাজের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন। এই কারণে আমরা দেখিতে পাই, বুদ্ধিজীবি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য অস্ত্রজীবি ক্ষত্রিয়ের জীবিকা গ্রহণ করিলেন। এই ভাবে সূর্য্যবংশের অবসান ঘটিয়া চন্দ্রবংশের

অভ্যুদয় ঘটিল। সমাজ জীবন হইতে বেদশাস্ত্রের প্রভাব উল্লেখ-যোগ্য ভাবে হ্রাস পাইল। এমন কি, ইহার অসারতা প্রমাণ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া তীব্র নিন্দাবাদ দিকে দিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। চন্দ্র-বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান শ্রীকৃষ্ণ বেদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করিলেন। বেদশাস্ত্রের ভগবান ইন্দ্রকে তিনি সম্পূর্ণরূপে বাতিল করিয়া দিলেন। সূর্য্যবংশীয় এবং ব্রাহ্মণ্য যুগের অবতার শ্রীরামচন্দ্রকে বাতিল করিবার উদ্দেশ্যে চন্দ্রবংশীয় হালিরাম অর্থাৎ বলরাম অবতার স্বীকৃত হইলেন। এইভাবে সমাজ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতি গভীর বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব অত্যধিক প্রবল হইয়া উঠিল।

"ক্ষাত্র ধর্ম্মের এই অভ্যুদয়ের পর এবং কলি যুগের সুচনার অন্তর্ব্বর্ত্তী-কালীন সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করিবার একটা অতি ক্ষীণ প্রচেষ্টা চলিয়াছিল। কিন্তু ইহার শৈশব উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই শাক্যপুত্র তথাগতের অমৃত বাণী সমাজ জীবনে যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করিল। মনে হয় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উপর ইহাই সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আঘাত। ভারতীয় সমাজ জীবনে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ভারতীয় ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলা চলে। মানব সভ্যতা সেই সময় একটা সুউচ্চ স্তরে পৌছিয়াছে। সেই কারণে আমরা পরিণত বুদ্ধি ভারতের সামাজিক, রাষ্ট্রীক ও আর্থিক জীবন পরিপূর্ণতায় ভরপূর দেখিতে পাই। সে যাহা হউক, মগধের ব্রাহ্মণ রাজা পুষ্যমিত্রের নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পুনরায় স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য সক্রিয় হইয়াছিল।

"ইহার পরবর্ত্তী সময়ে ভারতীয় বর্ণাশ্রম সমাজ জীবনের প্রবল প্রতিপক্ষদ্বয় বুদ্ধিজীবি ও অস্ত্রজীবির মধ্যে একটা স্থায়ী আপোষ মীমাংসার ভিত্তিতে শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল। বুদ্ধিজীবি ব্রাহ্মণ সন্তান শ্রীশঙ্করাচার্য্যের প্রভাবেই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন, বেদ-শাস্ত্রের অপরিপক্ক যুক্তি দ্বারা বৌদ্ধ মত খণ্ডন সম্পূর্ণ অসম্ভব।

নানাভাবে বিকৃত ও নির্জ্জীবপ্রায় অথর্ব্ব বৌদ্ধ মতবাদকে ক্ষাত্রধর্মী উপনিষদের সাহায্যে খণ্ডনের পথই শ্রেয়ঃ গণ্য করিয়া তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষাত্রধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ বুদ্ধিজীবির ভূমিকা ত্যাগ করিয়া অস্ত্রজীবি হইলেন। ইহার ফলে বর্ণাশ্রম আর্য্যসমাজ জীবনের বর্ণ-শ্রেষ্ঠদ্বয়ের অশ্রান্ত সংগ্রামের একটা স্থায়ী পরিসমাপ্তি ঘটিল।”

ভারতীয় সমাজ জীবনের উল্লিখিত কাহিনী আমরা মুখ্যতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত দেখিতে পাই। আর্য্যদের এদেশে আগমন হইতে বৌদ্ধ-যুগের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত বৈদিক-যুগ, শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-যুগ এবং ইহার পরবর্ত্তী কাল শঙ্কর-যুগ। জন্মান্তর-বাদের ভিত্তিতে গঠিত এবং বর্ণাশ্রমের নীতিতে পরিচালিত সমাজ ব্যবস্থায় শাসন ও শোষণ ক্ষমতা লাভের জন্য বুদ্ধিজীবি ব্রাহ্মণ ও অস্ত্রজীবি ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রেষারেষি, বিরোধ ও সংঘর্ষই বৈদিক যুগের মৌলিক প্রধান বৈশিষ্ট্য। কখনও দেখা যায়, বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় সমাজের শীর্ষস্থান দখল করিয়া সর্ব্বময় প্রভুত্ব করিতেছেন; আবার কিছুকাল পরে দেখা যায়, অস্ত্রজীবি ক্ষাত্রবীর্য্যের অস্ত্র ঝনৎকারে ব্রাহ্মণের জপ, তপ, তন্ত্রমন্ত্র নির্ব্বাক। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া পর্য্যায়ক্রমে ভারতীয় সমাজ রঙ্গমঞ্চে এই অভিনয় চলিল। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, বর্ণশ্রেষ্ঠদ্বয়ের ক্ষমতার লড়াইয়ের এই সুদীর্ঘ কাহিনীর মধ্যে অধঃবর্ণ অর্থাৎ কৃষিজীবি ও শ্রম-জীবি এবং অস্পৃশ্য এই সম্প্রদায়দ্বয়ের কোন ভূমিকার উল্লেখ নাই। প্রক্ষিপ্ত ভাবে তাঁহাদের অস্তিত্বের যে অতি সাধারণ উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা অনুধাবন করিলে স্বতই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, সমাজ রূপ মল্লভূমিতে ক্ষমতা দখলের যে তীব্র প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইত, তাহাতে তাঁহাদের প্রবেশাধিকার নাই—তাঁহারা মল্ল-ভূমির চতুঃসীমার বহির্ভাগে বহু দূরে অবস্থানকারী নির্ব্বাক দর্শক মাত্র। রুধির কর্দ্দমের পুতিগন্ধময় পিচ্ছিল পথে থর থর কম্পিত পদে অগ্রসর-

মান সমাজ জীবনে এই ক্ষণে শান্তি, মৈত্রী ও অহিংসার অমৃত বাণী কণ্ঠে লইয়া শক্তি পূজারী ক্ষত্রিয় রাজকুমার করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে ভারত-ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বুদ্ধের আবির্ভাবের যুগে ভারতীয় সমাজ জীবন একটা সুউচ্চ স্তরে পৌছিয়াছে। বৌদ্ধযুগের ইতিহাস সুগঠিত ও সুবিদিত এবং ভারতীয় সমাজ জীবনে শাক্য পুত্র সিদ্ধার্থ যে একটা যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ইহাও সর্ব্বজন স্বীকৃত। এই অধ্যায়ের মৌলিক প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, সুদীর্ঘ কাল হইতে শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত শক্তি পূজারী অস্ত্রজীবি ক্ষত্রবীর হিংসার ঐতিহ্যময় পথ ত্যাগ করিয়া অহিংসার আদর্শ ও নীতি গ্রহণ করিলেন। এই বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন শুধু অভিনব নহে—মহান ও সুন্দর। এই বিপ্লবের প্রাণবায়ু পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, চরম রক্ষণশীল বুদ্ধিজীবি ব্রাহ্মণ্যশক্তির বিরুদ্ধে সুদীর্ঘকাল একটানা সংগ্রামরত বীর ধর্ম্মী ক্ষত্র বীর নবোদ্যমে সংগ্রাম পরিচালনের উদ্দেশ্যে শক্তি সমাবেশ নীতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন। শত শত বৎসর ধরিয়া হৃদয়হীন রক্ষণশীলতা ও অনুদারতার অত্যুগ্র চাপে জর্জ্জরিত অধঃবর্ণদ্বয়—যাঁহারা ক্ষমতার দ্বন্দ্বে এতকাল নির্ব্বাক দর্শকরূপে অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ক্ষত্রকুলের শাক্যপুত্র শাক্যসিংহ তাঁহাদের সহিত মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বুদ্ধিজীবি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের উপর চরম আঘাত হানিলেন। এই মৈত্রী-বন্ধন ভারতীয় সমাজ জীবনের উন্নতি ও প্রগতি ধারাকে কিরূপ বেগবতী করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেরই সুপরিজ্ঞাত। উল্লিখিত নীতি কেন অনুসৃত হইল, তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, রাজ্য শাসনে বিব্রত ক্ষত্রসন্তান বুঝিলেন বুদ্ধি-জীবি—অস্ত্রজীবির অশ্রান্ত সংগ্রাম চলিবার সুযোগে তৃতীয়বর্ণ কৃষিজীবি সম্প্রদায় ব্যবসায় বুদ্ধিতে বলীয়ান হইয়া সমাজ জীবনের অনেকখানি স্থান দখল করিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহাদের সে আসন সুদৃঢ়। অস্পৃশ্য

চতুর্থ বর্ণের অন্তর্বেদনা আগ্নেয়গিরি গহ্বরের গলিত লাভা স্রোতের ন্যায় টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। অনুদার গুরুর তর্জ্জনীর ইঙ্গিতে পরিচালিত রাজদণ্ড এই বাস্তব সত্য অন্তরে অন্তরে গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়া সতর্ক বিচক্ষণতার সহিত গুরুর হৃদয়হীন সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উপর ইহাই সর্ব্বাধিক প্রবল আঘাত। ক্ষমতা প্রিয় ক্ষত্রধর্ম্মের জয় হইল। কিন্তু সমাজ জীবনে ধীরে ধীরে ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া জঘন্য অবয়ব লইয়া রঙ্গমঞ্চে বীভৎস নৃত্য সুরু করিল। সমাজ জীবনে নবাগত শক্তি অর্থ সর্ব্বস্ব বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থান্ধ অর্থকরী চক্রান্ত সাম্য, মৈত্রী ও করুণার মন্ত্রে দীক্ষিত সমাজকে নির্জ্জীব উদারতায় অথর্ব্ব করিয়া পূর্ণ অরাজকতায় ভরিয়া তুলিল। বীরধর্ম্মী ক্ষত্রশক্তি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিল, অর্থলোভী বণিক-স্বার্থ দেশ-জাতি-মান সবকিছু নির্ব্বিচারে ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে।

বুদ্ধিজীবি ব্রাহ্মণকুল বুঝিল মাহেন্দ্রক্ষণ সমুপস্থিত। ব্রাহ্মণ সন্তান শঙ্করাচার্য্য অনুতপ্ত, বিব্রত ও হতবুদ্ধি ক্ষত্রশক্তিকে ডাক দিলেন—মা ভৈঃ! নিরস্ত্র, নির্জ্জীব, ভারতের বুক শাণিত অসির ঝনৎকারে ভরিয়া উঠিল। হৃদয়হীন রক্ষণশীলতা সমাজ জীবনকে পুনরায় আষ্ঠে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মিলিত শক্তির অভ্যুদয় ঘটিল বটে, কিন্তু অর্থসর্ব্বস্ব বণিক স্বার্থও একটা প্রবল শক্তিরূপে সমাজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়া গেল। এই ক্ষেত্রে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বর্ণশ্রেষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে মৈত্রী সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও মিলিত শক্তি তৃতীয় পক্ষ জাগ্রত বণিক শক্তির সহিত হাত মিলাইল না। অর্থাৎ সমাজ জীবন পরিচালন, ক্ষেত্রে বুদ্ধি, অস্ত্র ও অর্থকরী শক্তির পরিপূর্ণ ঐক্য ও সহযোগিতা অপরিহার্য্য বলিয়া স্বীকৃত হইল না।

ভারতীয় সমাজ জীবনের উল্লিখিত তিন অধ্যায়ের নিরপেক্ষ সূক্ষ্ম সমালোচনা কালে আমরা আরও দেখিতে পাই জন্মান্তরবাদ রহস্যের

অশরীরি আবরণে ব্যক্তি স্বাধীনতা বৈদিক ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া আংশিক ভাবে এবং বৌদ্ধযুগের নিরীশ্বরবাদীয় কর্ম্মবাদকে অবলম্বন করিয়া পরিপূর্ণ উন্মত্তরূপ ধারণ করিয়াছিল। বর্ণাশ্রমকে আশ্রয় কারয়া রক্ষণশীলতার অত্যুগ্র বিষক্রিয়ায় ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ ঘটে 'বনে', 'মনে', আর 'কোণে' এবং 'অবিদ্যা' অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি দ্বারাই নির্ব্বাণ লাভ সম্ভব, এই তত্ত্বকথাগুলির মূলে ব্যক্তিকে সমষ্টির ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র রাখিবার অবিশ্বাস্য রূপ সতেজ প্রেরণা যে অত্যুগ্রভাবে সক্রিয় ইহা স্বীকার না করা আত্মপ্রতারণা ব্যতীত অপর কিছুই নহে।

সমস্যা, বিরোধ, সংঘাত, বিপ্লব যে শুধু ভারতীয় সমাজ জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে—জাগতিক সমস্যা বিশ্বের অন্যান্য অংশের নরনারীর জীবনেও উল্লিখিত ধারা অনুসরণ করিয়া নানারূপ বিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল। নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক নানা কারণে বিশ্বের অন্যান্য অংশের আলোড়ন দীর্ঘ দিন ভারতের দ্বার প্রান্তে আঘাতের ঢেউ সৃষ্টি না করিলেও খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫০০ অব্দে পারশিক, খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩০০ অব্দে গ্রীক, খৃষ্ট পূর্ব্ব ১০০ অব্দে Parthians and Sythians সভ্যতা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সশস্ত্রভাবে সদম্ভ পদক্ষেপ দ্বারা ভারতের মৃত্তিকা কম্পিত করিয়া তুলিল। ইহারই পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ বৌদ্ধযুগের শেষ এবং শঙ্কর যুগের অভ্যুদয়ের সময় ৬০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে মুখ্যতঃ এক হস্তে তরবারি ও অপর হস্তে কোরাণ লইয়া ধাবিত হইবার মন্ত্রে দীক্ষিত মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন যাযাবর দস্যুদল ভারতের বুকে হত্যা ও লুণ্ঠনের বিভীষিকা সৃষ্টি করিতে লাগিল। ভারতীয় সমাজ জীবনের তদানীন্তন অবস্থা পর্য্যালোচনা কালে আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বুদ্ধিজীবি ব্রাহ্মণ শক্তিকে পরাভূত করিবার উদ্দেশ্যে অস্ত্রজীবি ক্ষত্রশক্তি অর্থসর্ব্বস্ব বৈশ্য শক্তির সহিত হাত মিলাইয়া

সমস্ত দেশকে নিরস্ত্র ও স্থবির করিয়া তুলিয়াছে। হৃতবল বুদ্ধিজীবি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ইহার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া অস্ত্র-অর্থ সম্মিলিত শক্তির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া বুদ্ধিজীবি ও অস্ত্রজীবির নূতন ঐক্য সৃষ্টি করিলেন। বিশ্বের অন্যান্য অংশের তদানীন্তন অবস্থা অনুধাবন করিলে দেখা যায়। বুদ্ধি—অস্ত্র—অর্থ, এই ত্রিশক্তির সমবায়ে বিভিন্ন দল ও জাতি দুর্ব্বার বেগে ধরিত্রীর দিকে দিকে অভিযান সুরু করিয়াছে। সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে সমগ্র ভারত বহুলাংশে ঐক্যবদ্ধ হইলেও রাজনৈতিক ঐক্য অর্থাৎ উল্লিখিত ত্রিশক্তির মিলন সম্ভব হইল না। আমার মনে হয়, ভারতীয় সমাজ জীবন অবিশ্বাস্যরূপে পঙ্গু ও দুর্ব্বল হইবার ইহাই অন্যতম মুখ্য কারণ এবং ইহাই ভারতীয় সমাজ-জীবনের দ্বিতীয় পরাজয়।

এই অনৈক্য ও বিভেদ চূড়ান্ত অবয়ব গ্রহণের সুযোগে ইসলামিক সভ্যতা ভারতের উর্ব্বর বুকে অতিক্রুত শিকর বিস্তার করিয়া বিরাট মহীরুহে পরিণত হইল। বর্ণাশ্রমের হৃদয়হীনতায় নিষ্পেষিত ভারতে মুসলমান জনসংখ্যার হার দ্রুত বৃদ্ধি হওয়া মোটেই বিস্ময়কর নহে। মুসলমান অভিযাত্রী রাষ্ট্রনায়কগণের চরিত্র ও কার্য্যাবলী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ভারতের সম্পদ লুণ্ঠন ও ভারতীয় সংস্কৃতি ধ্বংস তাঁহাদের মূল লক্ষ্য ছিল। এই কারণে বহু ঐতিহাসিক তাঁহাদের ধর্ম্মান্ধ ও লুণ্ঠন প্রিয় দুর্দ্ধর্ষ দস্যু বলিয়া অবিহিত করিতে মোটেই কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। পরবর্ত্তী কালে কয়েকজন মুসলমান রাষ্ট্রনায়ক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু এদেশের স্থায়ী অধিবাসী হইয়াও তাঁহারা আর্য্যদের ন্যায় ভারতকে স্বদেশ অথবা মাতৃভূমি বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। নেতৃত্ব পূর্ব্বাপর বহিরাগত মুসলমানদের হস্তে ছিল বলিয়া ধর্ম্মান্তরিত ভারতীয় মুসমলানের সংখ্যা বেশী হইলেও স্বদেশ ও স্বজাতি বলিতে তাঁহারাও আরব, পারস্য, মক্কা, মদিনাকে

বুঝিতেন। পূর্ব্বাপর তাঁহাদের দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ আছে। স্থানীয় অধিবাসী রাজপুত, শিখ, মারাঠাদের সহিত মুগল, পাঠান ইত্যাদি মুসলমান শক্তিগুলির সহিত বিরোধ ও সংগ্রামের মধ্যে মুসলমানদের উল্লিখিত রূপ মনোভাব সম্পূর্ণ পরিস্ফুট না হইলেও পরবর্ত্তীকালে খৃষ্টান বণিক সম্প্রদায় এদেশে রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করিলে যে শোচনীয়, মর্ম্মন্তুদ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল তন্মধ্যে উল্লিখিত দৈন্যতা নগ্নভাবে আত্ম প্রকাশ করিয়াছিল। খৃষ্টান শাসক গোষ্ঠি এদেশ ত্যাগের প্রাক্কালে সেই দৈন্যতা বীভৎসরূপ পরিগ্রহ করিয়া বিশাল ভারতকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিল।

সুদীর্ঘ পরাধীনতার পর দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসমরের পরিণতিকে অবলম্বন করিয়া বৃটিশ পুঁজিবাদী স্বার্থ একটা অতি কূট ও সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত জাল বিস্তারের অঙ্গ হিসাবে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট খণ্ডিত ভারতের পুলিশী দায়িত্ব ত্যাগ করিয়াছে। উল্লিখিত গভীর চক্রান্তের ফলে বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতিতে বিরাট ও গভীর সঙ্কট দানা বাঁধিয়া উঠিবার মুহূর্ত্তে খণ্ডিত ভারতের সমাজ জীবন পরিচালন, সংগঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ অর্থাৎ দেশ রক্ষার দায়িত্ব ভারতীয় নরনারীর উপর আরোপিত হইয়াছে। এই দায়িত্বের পরিধি ও গভীরতা নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে ভারতীয় নরনারীর দৃষ্টি-ভঙ্গীকে ব্যাপক ও তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিবার উদ্দেশে ভারতীয় সমাজ জীবনের ক্রম-বিকাশের সুদীর্ঘ ও জটিল কাহিনীর অতি সংক্ষিপ্ত চুম্বক আলোচনা করিলাম। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া যে সকল প্রশ্ন সমস্যা সুস্পষ্ট অবয়ব গ্রহণ করিয়া সমাজ জীবনের বুকে জগদ্দল পাথরের ন্যায় অনড় অচল ভাবে চাপিয়া রহিয়াছে, ইহাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, নরনারী বর্ণাশ্রম সমাজ বিধির হৃদয়হীন সংকীর্ণতায় পঙ্কিলস্নাত হইয়া আত্মবঞ্চনাকে পরম সত্য গণ্য করিয়া আত্মঘাতী আত্মকলহে মগ্ন। জন্মান্তরবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব শ্রেয় ও

প্রেয়র সংগ্রামরূপে অশ্রান্ত ও বেগবতী হইয়া মানুষ মরার জন্য বাঁচে,-না, মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা লইয়া বাঁচিবার প্রয়োজনে মৃত্যুকে পর্য্যন্ত বরণ করে ; এই সহজ সরল প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্দ্ধারণের পরিপূর্ণ ব্যর্থতায় ভারতীয় নরনারীর জীবন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বোপরি ব্যক্তি স্বাধীনতার ভুয়া চরম অহমিকা রক্ষণশীলতার পঙ্কিলতায় হাবুডুবু খাইতেছে।

জীবনের অফুরন্ত প্রাচুর্য্য ও গভীর সবলতা লইয়া আজ ভারতীয় নরনারীকে সমাজ গঠন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। প্রত্যেক ভারতীয় নরনারীকে স্মরণ রাখিতে হইবে, স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। সুতরাং স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব, মানুষের জন্মগত। ইহাও অতীব সত্য যে, মানুষ সামাজিক জীব, ব্যক্তি স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া নরনারীর পক্ষে বনে জঙ্গলে বন্য জীবন যাপন সম্ভব হইলেও রাষ্ট্রীক স্বাধীনতাহীনভাবে সমাজ জীবন যাপন সম্ভব নহে—উহা মৃত্যুর সমতুল্য। মানুষের জন্মগত অধিকার সগর্ব্বে রক্ষা করিবার দায়িত্ব হইতে নরনারীকে বঞ্চিত করা শুধু পাপ নহে—দণ্ডনীয় অপরাধের সমতুল।

তৃতীয় অধ্যায়

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

সুদীর্ঘ পরাধীনতার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণতিকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটা অতি বিরাট জটিলতা ও সঙ্কট সৃষ্টি হইবার মুহূর্ত্তে খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার সুকঠোর দায়িত্ব ভারতীয় নরনারীর উপর আরোপিত হইয়াছে। সুতরাং বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং উহার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সীমান্তবর্ত্তী রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রগোষ্ঠির রাজনৈতিক আশাআকাঙ্ক্ষার বিষয় গভীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া আমাদের সীমান্ত রক্ষার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় মহাসমরের পরবর্ত্তী কালের ঘটনাবলী অবলম্বনে এই আলোচনা আরম্ভ করা সমীচীন। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসমরের পরিণতির রূপ সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে সঙ্কট সৃষ্টির মূল কারণ সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বৃটিশ, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, জাপান, ইতালী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কায়েমী স্বার্থসঞ্জাত দ্বন্দ্বের ফলেই মহাসমরের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য পুঁজি এবং সাম্রাজ্যবাদের শ্রেষ্ঠতম শত্রু সোভিয়েট রুশিয়া এই মহাসমরে জড়িত হইয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। কিরূপ অবস্থায় কি কারণে কি ভাবে রুশিয়া এই পুঁজিবাদী সংগ্রামে জড়িত হইয়াছিল ইহা আমরা পরে আলোচনা করিব।

এই বিরোধ কেন? প্রথমেই আমি বলিয়া রাখিতে চাহি যে, এই বিরোধ নূতন নহে এবং বিশ্বের অখৃষ্টান ও অশ্বেতাঙ্গ জাতিগুলির উপর শাসন ও শোষণ চালাইবার অধিকার সম্পর্কিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেই এই বিরোধের বীজ অন্তর্নিহিত। ষোড়শ শতাব্দীতে বৃটিশ,

ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী ও স্পেন দেশীয় দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদলের বেপরোয়া অভিযানের ফলে জলপথে প্রাচ্য ও প্রতীচীর মধ্যে সংযোগ পথ এবং সেইসঙ্গে নূতন মহাদেশ স্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও আবিষ্কৃত হয়। এই সময়েই ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ কতক বিষয়ে বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিবার ফলে শিল্প-জগতেও একটা বিরাট বিপ্লব সূচিত হয়। এই সকল অবস্থার সুযোগেই ইউরোপীয় পুঁজি অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করিতে থাকে। পুঁজিবাদের অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, নূতন দেশ আবিষ্কার, পররাজ্য জয় ও শাসন কর্তৃত্ব অধিকার করিয়াই ইহা সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। আরও দেখা যায় এশিয়া ও আফ্রিকার অনগ্রসর দেশ ও জাতিগুলির উপর শাসন ও শোষণ চালাইয়া এবং আমেরিকার অফুরন্ত সম্পদ লইয়া ইউরোপীয় পুঁজিবাদ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সঙ্কট জটিল হইয়া উঠে এবং তৎফলেই প্রথম বিশ্ব-মহাসমর সৃষ্টি হয়। বিরুদ্ধ পক্ষদ্বয়ের অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে পরিষ্কার দেখা যায়, সুদূর অতীতে কতক অবস্থার সুযোগে বৃটিশ ও ফরাসী পুঁজি সুদৃঢ় জাল বিস্তার করিয়া যে বিরাট সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে উহারই বিরুদ্ধে শিল্প ও বিজ্ঞানে শক্তিশালী জার্ম্মাণীর নেতৃত্ব অপর কয়েকটি বঞ্চিত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ইহা একটি সশস্ত্র প্রতিবাদ। ইহাই হইল প্রথম বিশ্ব মহাসমরের গোড়ার কথা।

দ্বিতীয় মহাসমরের পটভূমি ও নায়ক প্রায় হুবহু এক—তবে এশিয়ার পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাপান ইহাতে জড়িত হইয়াছিল। জাপান ইহাতে জড়িত হইবার কারণ এই যে, মুখ্যত এশিয়ার বিরাট বাজার লইয়া ইউরোপীয় শক্তিগুলি দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ। ইহার প্রথম সুযোগে অর্থাৎ প্রথম বিশ্বমহাসমরে জাপান মিত্রপক্ষভুক্ত থাকিয়া শিল্পবাণিজ্যের বিপুল প্রসার সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সুতরাং এশিয়ার

বাজার লইয়া ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে দ্বিতীয় দ্বন্দ্ব চলিবার কালে প্রতিবেশীকে শাসন ও শোষণ করিবার দুর্জ্জয় লোভ জাপ পুঁজিপতিদের সম্বরণ করিবার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু নাই। পুঁজিবাদী দৃষ্টি কোণ হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, এইরূপ বিরাট সুবর্ণসুযোগ উপেক্ষা নিতান্ত মূর্খতা। প্রথম মহাসমরে মিত্র-পক্ষভুক্ত জাপানের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিরুদ্ধ পক্ষ অর্থাৎ চক্রশক্তির সহিত যোগদানের ইহাই মূল কারণ। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, জাপান চক্রশক্তির পক্ষ-ভুক্ত হইলেও চক্রশক্তির নায়ক নাৎসী জার্ম্মাণী তাহাকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহার কারণও বিশেষ অস্পষ্ট নয়। ইউরোপের প্রত্যেক পুঁজিবাদী শক্তিই মনে করে যে, বিশ্ব শাসন ও শোষণের অধিকার শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান পুঁজিবাদীদের মধ্যে, একচেটিয়া রাখা প্রয়োজন। সুতরাং জাপানের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধিকে অবশ্যই সসীম রাখিতে হইবে। এই কারণে দ্বিতীয় মহাসমরে জয়লাভের ক্ষেত্রে জাপ-জার্ম্মাণ ঐক্য ও সামরিক সহযোগিতা যেরূপ গভীর ও সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন ছিল, তাহা সম্ভব হয় নাই।

প্রথম ও দ্বিতীয় মহাসমরের পরিণতি প্রায় একরূপ হইলেও দ্বিতীয় মহাসমরের সুদূরপ্রসারী ফল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। বিশেষ করিয়া এশিয়ার অনগ্রসর দেশ ও জাতিগুলির পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। মহাসমরের ফলে বৃটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত পৃথিবীর অপর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি বিধ্বস্ত। ফ্রান্স বিজয়ী—রাষ্ট্ররূপে স্থান পাইলেও পরাজিত রাষ্ট্রের সমপর্য্যায়ভুক্ত। নাৎসী সমরদানবের বীভৎস তাণ্ডব সহ্য করিয়া ফ্রান্সের সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীক জীবন পর্য্যুদস্ত ও পঙ্গু হইয়া গিয়াছে। এই কারণে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এত উৎকট হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, অনেকে মনে করেন, তথায় গৃহ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। অনেকে এইরূপ আশঙ্কাও করেন যে, ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ

বাধিলে পুঁজিবাদ হয়ত নিঃশেষে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। গৃহযুদ্ধের এই আশঙ্কাকে দূর করিবার জন্যই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুঁজিবাদী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক মার্শাল পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে।

পরাজিত রাষ্ট্র হিসাবে জার্ম্মাণী, জাপান ও ইতালী এই তিনটি পুঁজিবাদী ও শিল্পপ্রধান রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত। যুদ্ধোত্তর কালে বিজয়ী ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিদ্বয়ের চক্রান্ত যে নগ্নরূপ লইয়া ধাবিত হইতেছে তাহা অনুধাবন করিলে দেখা যায় অদূর ভবিষ্যতে দূরের কথা সুদূর ভবিষ্যতেও উল্লিখিত রাষ্ট্রত্রয়ের পক্ষে বৃটিশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সমশ্রেণী প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে পুনরায় বিশ্বের বাজারে অবতীর্ণ হওয়া কোন-ক্রমেই সম্ভব হইবে না। এমন কি হয়ত ইহাদের ভৌগোলিক সীমা পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবে। তবে একটিমাত্র কারণে এশিয়ায় জাপ-শক্তির পুনরুত্থানের সম্ভাবনা আছে। ইহা আমি পরে আলোচনা করিব। যুদ্ধ সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীক জীবনে বিরাট বিপর্য্যয় ও বিবর্ত্তন সৃষ্টি করিতে বাধ্য। দ্বিতীয় মহাসমরের পরিণতির মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি মুখ্য :—

(১) ইঙ্গ-মার্কিন ব্যতীত অপর সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ভাঙিয়া পড়াতে তাহারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িয়াছে।

(২) নাৎসী তথা চক্রশক্তির সমরদানবের অত্যুগ্র চাপে জর্জ্জরিত হইয়া মার্কিন ও বৃটিশ (কমনওয়েলথ ও সাম্রাজ্য সহ) উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থা একই পরিকল্পনাধীনে পরিচালিত হইতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় পুঁজিবাদী সংগ্রামে তাহাদের জয়লাভের ইহা অন্যতম মুখ্য কারণ। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই দুই রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে বিশ্বের ধন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম।

(৩) ইহার ফলে বিশ্বের বাদবাকী দেশ ও জাতি সমূহের পক্ষে এই দুই রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী অর্থাৎ সর্ব্বাংশে তাঁবেদার হওয়া ব্যতীত

গত্যন্তর নাই। সৌরজগতে পৃথিবীর নরনারীর বসবাসযোগ্য একটি গ্রহ অথবা উপগ্রহ আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত সঞ্চিত ধন-সম্পদ ;—যাহা পুঁজিরূপে জমিয়া উঠিয়াছে, উহাকে স্থান-ভ্রষ্ট করা সম্ভব নহে। অধিকন্তু ইতিপূর্ব্বে যে পরিমাণ পুঁজি বিক্ষিপ্ত ছিল তাহাও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিণতিকে অবলম্বন করিয়া সুদৃঢ় ইঙ্গ-মার্কিন কোষাগারে সঞ্চিত হইবার ফলে উহা দুর্জ্জয় ও দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছে।

(৪) ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিবাদ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছে বটে, কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে বিশ্বের চাহিদা পূরণ করা তাহাদের পক্ষে আপাততঃ সম্ভব হইতেছে না অর্থাৎ জার্ম্মাণ, জাপান, ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি শিল্প প্রধান রাষ্ট্র বিশ্বের বিরাট চাহিদার যে অভাব পূরণ করিত, ইঙ্গ-মার্কিন শিল্পপতিদের পক্ষে হঠাৎ সেই শূন্যস্থান পূরণ করা সম্ভব হইতেছে না। বিশ্ব অর্থনৈতিক জীবনে সঙ্কট সৃষ্টির ইহা অন্যতম মুখ্য কারণ। কিন্তু এই সঙ্কটকে পুঁজি করিয়া বিশ্বব্যাপী ইঙ্গ-মার্কিন অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য বিস্তার করাই তাঁহাদের চক্রান্তের প্রাণবস্তু।

তাই বলিতে হয় বাষ্পীয় শকটে আরোহণ করিয়া পুঁজিবাদ একদিন প্রস্তরযুগের পাষাণ প্রাচীর নিঃশেষে ধূলিসাৎ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল। আণবিক শক্তি মদমত্ত পুঁজিবাদ লৌহদানবকে দলিয়া পিষিয়া লক্ষ বাহু বিস্তার করিয়া বেপরোয়াভাবে ছুটিয়া চলিবে না ইহা বিশ্বাস করিবার কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি ?

পুঁজিবাদের শ্রেষ্ঠ শত্রু সোভিয়েট রুশিয়া দ্বিতীয় মহাসমরের অন্যতম বিজয়ী শক্তি। নাৎসী শক্তির আক্রমণে জর্জ্জরিত হইয়া সোভিয়েট রুশিয়া পুঁজিবাদী শক্তি-পুঞ্জের সহিত হাত মিলাইতে বাধ্য হইয়াছিল। যুদ্ধোত্তরকালে দেখা যায়, তাঁহাদের সে মৈত্রীবন্ধন অটুট থাকা দূরের কথা মৈত্রী চরম শত্রুতায় পর্য্যবসিত হইতেছে। ইহা মোটেই অপ্রত্যা-

শিত নহে—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক পরিণতি। এই অবস্থায় আমরা দেখিতে পাই বিশ্বরাষ্ট্র শক্তিগুলি অতি দ্রুত কম্যুনিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট বিরোধী এই দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে।

মুখ্যতঃ দুইটি দল পরিদৃষ্ট হইলেও একটু গভীর ভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায়, শেষোক্ত দল স্বেচ্ছায় অথবা একান্ত অনিচ্ছায় অতি দ্রুত চারিটি উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। এই বিভাগ অভিনব না হইলেও যে ভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে—সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থা, ঘটনা স্রোত এবং গঠন অবয়বের মধ্যে অনেকখানি নূতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। এই বিভাগের ভিত্তি ধর্ম্ম। ইঙ্গ-মার্কিন লিমিটেডের অনুসৃত নীতির ফলে সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, স্পেন, পর্ত্তুগাল, গ্রীস, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, গ্রীণল্যাণ্ড ও লাটিন আমেরিকার দেশগুলি লইয়া শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান জগত; ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী মরক্কো, টিউনিসিয়া, লিবিয়া, মিশর, প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, তুরস্ক, সৌদি আরব, ইরাক, ইরাণ, আফগানিস্থান, পশ্চিম ও পূর্ব্ব-পাকিস্থান, মালয়, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি অঞ্চলগুলি লইয়া মুসলিম রাষ্ট্রশৃঙ্খল অথবা মুসলিম জগত; সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, ইন্দোচীন, চীন, জাপান ও তিব্বত ইত্যাদি দেশ খণ্ডকে লইয়া বৌদ্ধ জগত এবং এই অদ্ভুত পরিবেষ্টনীর মধ্যস্থলে নবগঠিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্ররূপে হিন্দু জগত গড়িয়া উঠিতেছে।

উল্লিখিত ধর্ম্মগুরুগণ বহুকাল পূর্ব্বে ধরিত্রীর বুকে জন্মগ্রহণ করিয়া স্ব স্ব সাধনা-লব্ধ মতবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে ধর্ম্মের ভিত্তিতে গঠিত বহু রাজ্য ও সাম্রাজ্যের উত্থান পতন হইয়া গিয়াছে। তথাপি বিংশ শতাব্দীর এই নূতন বিভাগ সৃষ্টির মধ্যে Old wine in new bottle' এর ব্যবস্থা দেখিয়া আণবিক যুগের মনে স্বতঃই

প্রশ্ন জাগে ইহার পশ্চাতে কোন অদৃশ্য হস্ত অথবা চিন্তা নায়কের প্রভাব আছে কি? ইহার আলোচনা আমরা পরে করিব।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, সোভিয়েট রুশিয়ার পক্ষপুটকে আশ্রয় করিয়া পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, জার্ম্মাণীর কতকাংশ, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বল্কান রাষ্ট্রগুলির সমবায়ে শক্তিশালী কম্যুনিষ্ট ব্লক এবং ইঙ্গ-মার্কিন লিমিটেডের পরিচালনাধীনে উল্লিখিত তিনটি উপদলের সমন্বয়ে কম্যুনিষ্ট বিরোধী ব্লক গড়িয়া উঠিতেছে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে উল্লিখিত দল দ্বয়ের মধ্যে যে সকল পার্থক্য বিদ্যমান তাহা ব্যতীত অপর একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য এই যে কম্যুনিষ্ট দল দ্বন্দ্ব-সমুৎপন্ন-জড়বাদ অর্থাৎ নিরীশ্বর বাদে বিশ্বাসী এবং বিরোধী দল প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে পৌত্তলিক এবং একেশ্বর অথবা বহু ঈশ্বরে আস্থাবান। সংহতি ও শক্তির দিক হইতে দেখা যায়, দ্বিতীয় পুঁজিবাদী মহাসমরের পরিণতিকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বের যে পরিমাণ পুঁজি বিক্ষিপ্ত ছিল উহার সর্ব্বাধিক অংশ সুদৃঢ় ও শক্তিশালী বৃটিশ এবং মার্কিন কোষাগারে সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং পুঁজিবাদী যুগের একচ্ছত্র নায়ক ইঙ্গ-মার্কিন লিমিটেডের পক্ষভুক্ত খৃষ্টান জগতের ঐক্য ও শক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতে বাধ্য। মার্শাল পরিকল্পনা, প্যারিস সম্মেলন ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'পুঁজিবাদী চক্রান্ত' এই জিগীর তুলিয়া মার্শাল পরিকল্পনা ও প্যারিস সম্মেলন বর্জ্জনকারী সোভিয়েট রুশিয়ার সমর্থক রাষ্ট্রগুলির কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিলে বুঝা যায়, কম্যুনিষ্ট ব্লকের ঐক্য ও শক্তি সঞ্চয় প্রচেষ্টা সবল, সক্রিয় ও আন্তরিক।

আরব লীগের কার্য্যাবলী অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, তাঁহারা প্রাণবত্তার পরিচয় প্রদানে বিশেষ সচেষ্ট। কিন্তু মুসলিম রাষ্ট্রগুলি খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত, অনগ্রসর ও দরিদ্র; অনেকটা মধ্যযুগীয় আচার,

নীতি ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সুতরাং স্বতই প্রশ্ন উঠে, মধ্য প্রাচ্যের মরু অঞ্চলের যাযাবর বেদুইন দস্যুদল প্রায় ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে যে মহান পুরুষের বিরাট ব্যক্তিত্বের ফলে ঐক্যবদ্ধ হইয়া ইসলাম জগত সৃষ্টি করিয়াছিল, বিংশ শতাব্দীতে ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্ব তীর হইতে ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তের মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থিত মুসলমান নরনারীকে একই রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিবার ন্যায় শক্তি ও প্রাণবত্তা সে নীতি শাস্ত্রের মধ্যে অবশিষ্ট আছে কি ?

একমাত্র বৌদ্ধ প্রধান রাষ্ট্রগুলির মধ্যেই বৌদ্ধরাষ্ট্র সংহতি গঠনের কোনরূপ প্রচেষ্টা অদ্যাবধি পরিলক্ষিত হয় নাই। জাপান বিধ্বস্ত (অবশ্য পূর্ব্বে অনুরূপ কোন চেষ্টা জাপান চালায় নাই) চীন গৃহ-যুদ্ধের সর্ব্বনাশা আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইতে চলিয়াছে, তিব্বত হিমগিরির সুশীতল বুকে নিদ্রামগ্ন, শ্যাম অতিশয় ক্ষুদ্র রাষ্ট্র, সিংহল ক্ষুদ্র ও সদ্য পরাধীনতা মুক্ত, ব্রহ্ম সবেমাত্র বৈদেশিক শাসন মুক্ত হইয়া অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা স্থাপনে অতিমাত্রায় ব্যস্ত। বৌদ্ধ রাষ্ট্রখণ্ড গুলির ভৌগোলিক অবস্থান লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, এশিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্ব, ও মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলের বিরাট অংশ তাঁহাদের দখলে রহিয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় তিনটি দিক বৌদ্ধ রাষ্ট্রখণ্ড গুলির দ্বারা পরিবেষ্টিত। পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্রুত অনুকূল হইয়া উঠিতেছে, সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে বৌদ্ধরাষ্ট্র সংহতি গঠনের চিন্তাধারা দানা বাঁধিয়া উঠিবে না এইরূপ ভবিষ্যৎবাণী জোড়ের সহিত করা চলে না।

নবগঠিত ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বিদেশী শাসক গোষ্ঠির আড়াই শত বৎসর ব্যাপী শাসন ও শোষণের কবল হইতে সদ্য মুক্তিলাভ করিয়াছে। ভারতের বুকে বিদেশীর শাসন ও শোষণ আড়াইশত বৎসর বলিলে একটু ভুল হয়। সাত শত অথবা হাজার বৎসর বলিলেই বাস্তব সত্যকে

স্বীকার ও সমস্যার স্বরূপ নির্দ্ধারণের পথকে সুগম করা হয়। একদল বিদেশী সমালোচক ইহাও বিশেষ জোড়ের সহিত উল্লেখ করেন যে, স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতে বিদেশীর শাসন ও শোষণ চলিয়া আসিতেছে। দৃষ্টান্ত ও যুক্তি হিসাবে তাঁহারা বলেন—আর্য্যরা কে? সে যাহা হউক স্বাধীনতার অমৃত ধারা পান করিয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সবে মাত্র জগত সভার পানে মুখ তুলিয়া চাহিতে শিখিতেছে। সুতরাং হিন্দু জগতের ঐক্য ও শক্তি কতটুকু তাহা অতি সহজেই অনুমেয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখা অবশ্য প্রয়োজন মনে করি যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে হিন্দুর সংখ্যা গরিষ্ঠতা অত্যধিক হইলেও ভারতীয় রাষ্ট্র-নায়কগণ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বহুবার ঘোষণা করিয়াছেন—'ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই ধর্ম্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র থাকিবে'।

উল্লিখিত দুই পক্ষের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য্য ও আসন্ন কি না, ইহা লইয়া বহু মতবাদ বিদ্যমান। অনেকে বলেন, অর্থ-নৈতিক কারণেই সংকট সৃষ্টি হয়। বর্ত্তমানে ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিবাদ বিশ্বের সর্ব্ববৃহৎ অঞ্চলে একচেটিয়া প্রভুত্ব বিস্তারের সুযোগ লাভ করিয়াছে। কাজেই তাহাদের অর্থ-নৈতিক স্বার্থ মোটেই বিপন্ন নহে। আদর্শ ও মতবাদ লইয়া সশস্ত্র সংগ্রাম বাঁধিবার নজীর মধ্যযুগের ইতিহাসে দৃষ্ট হয় বটে; বিংশ শতাব্দীর বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সে সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা আরও বলেন সেই সকল মধ্য-যুগীয় কাহিনী ধর্ম্মোন্মত্ততা মাত্র।

ধর্ম্ম মানুষের জন্য সৃষ্ট। মানুষের সামাজিক আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবন প্রগতিমুখী রাখিয়া সুনিয়ন্ত্রিত করিবার নীতি শাস্ত্রকে যদি ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করা না হয় তাহা হইলে ইহার অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শ ও মতবাদ যে ধর্ম্মকে ভিত্তি করিয়া রচিত ইহা অস্বীকারের উপায় নাই। কাজেই ধর্ম্মযুদ্ধ ও অর্থ নৈতিক কারণে যুদ্ধ

এতদুভয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নহে। এই অবস্থায় আদর্শ ও মতবাদ লইয়া সংগ্রাম বাধিবে না সেই যুক্তি অচল এবং সোভিয়েটের সহিত ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির সংঘাত অনিবার্য্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে। প্রশ্ন এই যে, উক্ত সংগ্রাম কি আকার ধারণ করিবে অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রাম চলিবে অথবা অপর কতক অবস্থার সহিত ভৌগোলিক অবস্থার সুযোগে সোভিয়েট রুশিয়া ও কম্যুনিজমকে রুশিয়ার সীমান্ত মধ্যে সমাহিত রাখিবার নীতি অনুসৃত হইবে? আমার মনে হয়, সোভিয়েট আক্রমণ না চালাইলে ইঙ্গ-মার্কিন রাষ্ট্র নায়কগণ শেষোক্ত পন্থাই গ্রহণ করিবেন।

আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির এই পরিপ্রেক্ষিতে এইবার আমি ভারত-সীমান্তবর্ত্তী রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক দিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বিরাট অংশ জুড়িয়া ভারত অবস্থিত। ইহার সীমান্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে স্বতঃই এশিয়ার সমস্ত রাষ্ট্রের আলোচনা অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়ায়।

চতুর্থ অধ্যায়

এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি

চীন

ভৌগোলিক দিক আলোচনার সময় দেখা গিয়াছে যে, ভারতের সুদীর্ঘ উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত বরাবর অর্দ্ধবৃত্তাকারে অবস্থিত হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর অপরপৃষ্ঠেই চীন অবস্থিত। মহাচীন পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। আয়তন ৪২ লক্ষ বর্গমাইল অর্থাৎ এশিয়ার প্রায় এক চতুর্থাংশ। ভারত অপেক্ষা প্রায় আড়াই গুণ বৃহৎ। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ মহাচীনের অধিবাসী। ১৯১২ সালে চীনের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। খাস চীন, মঙ্গোলিয়া, সিনকিয়াং, মাঞ্চুরিয়া, চিনথাই, সিকাং ও তিব্বত লইয়া চীন গণতন্ত্র গঠিত। অধিবাসীরা মঙ্গোল জাতীয় এবং বৌদ্ধ ও কনফিউশিয়াস ধর্ম্মাবলম্বী। লোক শংখ্যা ৪৩ কোটি। বৌদ্ধ প্রধান রাষ্ট্রের মধ্যে ইহা সর্ব্ববৃহৎ।

পামীর গ্রন্থি হইতে হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী বাহির হইয়া যেমন অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে দক্ষিণ-পূর্ব্ব ও পরে পূর্ব্ব দিকে বিস্তৃত, ঠিক উহার সমান্তরাল ভাবে আঁকিয়া বাঁকিয়া হিমগিরির অপর পৃষ্ঠ ঘেঁষিয়া মহাচীনের সীমারেখা গিয়াছে। যে পর্ব্বতশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ চূড়া অদ্যাবধি মানুষের পদ ধূলিতে কলঙ্কিত হয় নাই, সেই দুর্লঙ্ঘ্য স্থানে স্থানে চিরতুষারাবৃত ও গভীর জঙ্গলাকীর্ণ পর্ব্বত প্রাচীর ভারত ও মহাচীনের মধ্যে দৈহিক বিভাগ সুদৃঢ় রাখিলেও উভয় রাষ্ট্রের সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক আদান প্রদানের ভিতর দিয়া গভীর হইতে গভীরতর হওয়ায় প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করিতে পারে নাই। আধ্যাত্মিকতার বিশ্বপীঠস্থান পবিত্র ভারত ভূমির ধূলিকণা মস্তকে ধারণ

করিয়া পূর্ণ ও ধন্য হইবার জন্য সভ্যতার আদি লীলাভূমি চীনের জ্ঞান পিপাসু মনীষী ও হাজার হাজার তীর্থ যাত্রীর দল সুগভীর তুষারান্তরালে লুক্কায়িত কালো ও কঠিন পাষাণ প্রাচীর বুকের শত সহস্র হিংস্র শ্বাপদ সরীসৃপ সঙ্কুল গভীর অরণ্যানীর বুক পাতি পাতি করিয়া রন্ধ্রপথ গুলি দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়া জীবন-স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই সকল পথে গমনাগমন যে কিরূপ ভীষণ তাহা আমরা চীনা পরিব্রাজক ফা হিয়ানের বিবরণ হইতে উপলব্ধি করিতে পারি। দীর্ঘদিন পরে স্বদেশে ফিরিয়া সে পথের স্মৃতি লিপিবদ্ধ প্রসঙ্গে একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন—'ঐ সমস্ত পর্ব্বতে বিশালকায় বিষধর ড্রাগন সমূহ আছে। ইহারা পথ যাত্রীদের গায়ে বিষ ও প্রস্তর খণ্ড বর্ষণ করে। সহযাত্রীদের মধ্যে আমরা কয়েক জন মাত্র এই বিপদ হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম।' হিমালয়ের সুউচ্চ অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত পার্ব্বত্য ঝড়ের রূপ তিনি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা সঠিক ও জীবন্ত। অদ্যাবধি উল্লিখিত পার্ব্বত্য ঝড়ে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে!

অপর এক স্থানে ফা হিয়ান লিখিয়াছেন—'বুক ঘেষিয়া যে পর্ব্বত দণ্ডায়মান উহা যেন ঠিক ১০ হাজার ফুট খাড়া পাষাণ প্রাচীর—পা রাখিবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত নাই—অপর পার্শ্বে শূন্য গর্ভ অন্ধকার—দৃষ্টি গুলিয়ে যায়—মাথা ঘুরে।'

অতীতে চীনা মনীষিগণ জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের জন্য ভারতের দিকে সুতীব্র নজর রাখিলেও দেখা যায়, রাষ্ট্রনায়কগণ ভারতীয় অঞ্চল বিশেষ অধিকার দ্বারা সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন কখনও দেখেন নাই। বিংশ শতাব্দী আন্তর্জ্জাতিকতার যুগ। বিশ্বের সুদূর কোণের একটি গৃহে এক সন্ধ্যা হাঁড়িতে ভাত না চড়িলে বহু দূরবর্ত্তী অপর অংশের নরনারীর টনক নড়িয়া উঠে। আবার স্বার্থক্ষুন্ন অথবা বিপন্ন হইবার

কোনরূপ আশঙ্কা না থাকিলেও আন্তর্জ্জাতিক বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য নিজেকে সমগ্রভাবে বিপন্ন করিয়া বিরোধের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হয়। এইরূপ বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভারত-চীন বিরোধ ঘটিবার—বিশেষ করিয়া চীন গণতন্ত্র কর্ত্তৃক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা আছে কিনা ইহাই হইল আমাদের প্রশ্ন।

মতবিরোধ সৃষ্টি হইবে না ইহা চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে দ্বিধাহীন ভাবে জোড়ের সহিত ঘোষণা করা চলে না। আবার ইহাও সত্য যে মতবিরোধ সৃষ্টি হইলে সশস্ত্র সংঘাত সুরু হইবে এমনই বা কি কথা আছে। বিরুদ্ধ মতাবলম্বী অপর পক্ষের যুক্তি উপেক্ষা করিবার সন্তোষজনক কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়াও মুস্কিল।

এই অবস্থায় চীনের রাজনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। ১৯১২ সালে চীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার পরও মহাচীনের কতকগুলি অঞ্চলে বৃটিশ, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স ইত্যাদির আঞ্চলিক অধিকার ছিল। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মধ্যে বৃটিশ ও মার্কিন ১৯৪২ সালের ৯ই অক্টোবর; হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম ১৯৪৩ সালে; ফ্রান্স ১৯৪৬ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী; পর্ত্তুগাল ১৯৪৭ সালের ১লা এপ্রিল উল্লিখিত আঞ্চলিক অধিকার ত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। চীন স্বাধীন ও গণতন্ত্রসম্মত রাষ্ট্র হইলেও সমগ্র ভাবে বৃটিশ ও মার্কিন পুঁজির তাঁবেদার। ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিবাদের তাঁবেদার গণতান্ত্রিক চীন কম্যুনিষ্টদের সহিত জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত। সংগ্রামের গতিধারা লক্ষ্য করিলে স্বতঃই মনে হয় এই সংঘাতই চীনের জাতীয় জীবনের সত্তা—সংগ্রামের হুড়াহুড়ি থামিলে চীন বোধ হয় অহিফেন যুগ অপেক্ষাও বেশী তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে।

এই গৃহ যুদ্ধ কেন? প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই, ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিবাদী চক্রান্ত অকটোপাসের ন্যায় চীনের সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও

অর্থনৈতিক জীবনকে গ্রাস করিতেছে। অপর পক্ষে ইহা হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য চিয়াং-দলীয় চীনা জননায়কদের চেষ্টা মোটেই আন্তরিক ও সবল নহে। এইরূপ গুরুতর অভিযোগ সম্পর্কে অনেকেই হয়ত অত্যন্ত সবলভাবে প্রতিবাদ উত্থাপন করিবেন। কিন্তু একটু গভীর-ভাবে তলাইয়া দেখিলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, চীনের বর্ত্তমান নেতৃত্ব চীনের প্রকৃত মঙ্গল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণাহীন—এক কথায় অন্ধ। বৃটিশ ও মার্কিন শিক্ষা ও প্রচার উল্লিখিত অজ্ঞতার জন্মদাতা। বৈদেশিক ও বিজাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি গ্রহণের প্রকারভেদে শ্রেষ্ঠত্ব ও হীনত্ব বোধ সৃষ্টি করে। জাপ নরনারী পাশ্চাত্যের সুন্দর ও মঙ্গলকর যাবতীয় কিছু আপনার শ্রেষ্ঠত্ববোধ লইয়া গ্রহণ করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহারা অনুকরণ করিতে যাইয়া আপন সত্তা ও বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জ্জন দেন নাই। পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞান জীবনের জয়যাত্রার পথে অপরিহার্য্য বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইলেও স্বীয় অনগ্রসরতার জন্য তাহাদের মধ্যে হীনত্ববোধ সৃষ্টি হয় নাই। চীনাদের মধ্যে দেখা যায়, বিপরীত ভাব সৃষ্টি হইয়াছে—পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির নিকট তাঁহারা আত্মবিক্রয় করিয়াছেন। ফলে তাঁহাদের মধ্যে হীনত্ববোধ সৃষ্টি হইয়াছে। আরও একটু বিশদভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, ইঙ্গ-মার্কিন বিভেদনীতি চীনা খৃষ্টান সম্প্রদায়কে অবলম্বন করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। তাঁহাদের শোষণ ও শাসন নীতি ইঁহাদের পোষণে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। চীনের নেতৃত্ব এই শ্রেণীর হাত হইতে পরিবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত চীনের উন্নতি ও প্রগতি সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ হীনত্ববোধ ব্যাধিগ্রস্ত নরনারী বিশেষ-ভাবে আত্মকেন্দ্রিক, নিজের ক্ষুদ্রস্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে তাঁহারা সমষ্টির স্বার্থ নির্ব্বিচারে বলি দান করিতে প্রস্তুত। সুতরাং চীনের উল্লিখিত শ্রেণীর হাত হইতে নেতৃত্বপদ স্খলিত হইবে এই ভয়ে তাঁহারা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণ

ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষপুটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরম নিশ্চিন্তে কাল কাটাইতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত।

ভারত-চীন বিরোধ সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, একমাত্র এশিয়ার নেতৃত্বপদ লইয়া উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সশস্ত্র সংঘাতে পরিণত হইবে বলিয়া বিশেষ জোড়ের সহিত ভবিষ্যদ্বাণী করা অবশ্য চলে না। এশিয়ার নেতৃত্বপদ গ্রহণের জন্য চীন কিরূপ নীতি অনুসরণ করিবার সম্ভাবনা আছে তাহা বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, চীন এশিয়ার বৌদ্ধ রাষ্ট্রসংহতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিলে উহা বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে। সেই অবস্থায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম সীমান্ত ব্যতীত অপর সকল দিক বৌদ্ধরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইবে। ইহাও সত্য যে বৌদ্ধ রাষ্ট্রসংহতির ফলে ভারত তথা সমস্ত এশিয়া বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও সভ্যতায় প্লাবিত হওয়া অস্বাভাবিক অথবা অগৌরবের বিষয় নহে। ভারত বৌদ্ধধর্ম্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্মভূমি। ভারতীয় বৌদ্ধনরনারী একসময় তমসাচ্ছন্ন এশিয়ার বুকে আলোকবর্ত্তিকা তুলিয়া ধরিয়াছিল। এশিয়ার ধূলিকণা অদ্যাবধি সেই অত্যুজ্জ্বল রশ্মিছটায় ঝলমল করিতেছে। সুতরাং বৌদ্ধ রাষ্ট্রসংহতি ও ইহার ফলে ভারত বিপন্ন হইবার আশঙ্কাকে নির্ব্বিচারে বাতিল করা চলে। গুরুগৃহে শিষ্যের আশ্রয় গ্রহণ কোন কালে কোন দিক হইতে বিপদ বলিয়া গণ্য হয় নাই—ইহা বিপদ পদবাচ্য হইতে পারে না। ভীতির যে কারণগুলি সুস্পষ্ট অবয়ব ধারণা করিয়া উঠিতেছে তাহা বৌদ্ধ রাষ্ট্রসংহতির মধ্যে নিহিত নহে। দীর্ঘ পরাধীনতা, বৈদেশিক শাসন ও শোষণের ফলে এশিয়ার বৌদ্ধ রাষ্ট্রগুলি সর্ব্বাধিক জরাজীর্ণ। পুঁজিবাদী স্বার্থের সর্ব্বাধিক পীড়ন সহিয়া উল্লিখিত রাষ্ট্রগুলি বর্ত্তমানে পুঁজিবাদী শোষণ নীতির বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার জন্য সচেষ্ট

এবং ইহার জন্য ইউরোপীয় খ্রীষ্টান পুঁজিবাদই যে সর্ব্বাধিক দায়ী, ইহা বলা বাহুল্য। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে যে লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে তাহা গভীরভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায়, ভৌগোলিক অবস্থার সুযোগে এশিয়ার, দুর্ব্বল, ঐক্যহীন অথচ উদার বৌদ্ধ রাষ্ট্রগুলির নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য সোভিয়েট রুশিয়া সবলভাবে সক্রিয়। সোভিয়েট প্রচারকগণ হয়ত মনে করেন যে, মধ্যযুগীয় পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ছিল। কায়েমী স্বার্থকে নিরঙ্কুশ করিতে যাইয়া তাঁহাদের সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা ইত্যাদি রক্ষণশীলতার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মঘাতী নীতির ধারক ও বাহক হইয়া পড়িয়াছিল। কপিলাবস্তুর রাজপুত্র সর্ব্বপ্রথম ইহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার বাণীতে আমরা পাই—'কর্ম্মই জীবের জীবন—শ্রেণীবৈষম্য সৃষ্টি দ্বারা নরনারীর কর্ম্মজীবনকে বিভিন্ন দিক হইতে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া পঙ্গু ও অথর্ব্ব করিবার নীতি শান্তি ও প্রগতির সম্পূর্ণ-পরিপন্থী। মানুষ জীবজগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সুতরাং পারস্পরিক রেষারেষি ও হানাহানি জনিত রুধির কর্দ্দমাক্ত-মানবজীবনকে শ্রী ও শান্তিপূর্ণ করিতে হইলে সমাজ-জীবনের প্রতিস্তরে সমানাধিকারেরে ভিত্তিতে অহিংসার অনুশীলন অপরিহার্য্য।' সমাজ ও সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার ইহাই বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। এই কারণে রুশ বিপ্লবের পর মার্ক্সীয় অর্থনীতিতে বিশ্বাসী রুশ কম্যুনিষ্ট নায়কগণ উক্ত অর্থনীতির দার্শনিক দিক বৌদ্ধ দর্শনের সাহায্যে অকাট্য করিয়া তুলিতে বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, বৌদ্ধ রাষ্ট্রখণ্ড গুলির উপর কম্যুনিষ্ট দলের দৃষ্টি বিভিন্ন দিক হইতে গভীরভাবে নিবদ্ধ।

সাম্রাজ্য ও সমরবাদী জাপ রাষ্ট্রনায়কগণের প্রভাবে কম্যুনিষ্টদের কার্য্যকলাপ অতি ক্ষীণভাবে দীর্ঘকাল চীনের উত্তরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল

কিন্তু দ্বিতীয় পুঁজিবাদী সংগ্রামে জাপানের পরাভব ও সোভিয়েটের জয়লাভ এবং মহাসমর সমাপ্তির অত্যল্পকাল পরে ভারত ও ব্রহ্মে বৃটিশ পুঁজিবাদ পুলিশি দায়িত্ব ত্যাগ করিবার ফলে অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। সুতরাং দেখা যায়, বৌদ্ধ রাষ্ট্রগুলিতে কম্যুনিষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া যেরূপ বিপজ্জনক সেই তুলনায় বৌদ্ধ রাষ্ট্র-সংহতি জনিত ভীতি অকিঞ্চিৎকর। চীনে কম্যুনিষ্ট প্রভাব বৃদ্ধি ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইহাও আবার সত্য যে, জাতীয়তাবাদী চীনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও প্রগতি ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির মোটেই কাম্য নহে। এই কারণে জাতীয়তাবাদী চানের অগ্রগতিকে পদে পদে বিপন্ন করিবার জন্য অহিফেনের নেশা মুক্তচীনে তাঁহারা গৃহযুদ্ধের বীভৎসতায় ইন্ধন যোগাইতেছেন। উল্লিখিত অভিযোগ সম্পর্কে অনেকে হয়ত এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিবেন যে, চীনের গৃহযুদ্ধের জন্য ইঙ্গ-মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষকে দোষারোপ করা চলে না। ইহার জন্য সোভিয়েট রুশিয়া সর্ব্বাংশে দায়ী। সোভিয়েট রুশিয়া চীনের গৃহ-যুদ্ধের জন্য দায়ী কি? এক কথায় বলা চলে হাঁ। কিন্তু ইহার জন্য সোভিয়েটের উপর দোযারোপ করা চলে না। রুশিয়া কম্যুনিষ্ট মতবাদের ধারক ও বাহক। বিশ্বের প্রতি গৃহে কম্যুনিষ্ট মতবাদ প্রচারের নৈতিক অধিকার তাহার আছে। বিশ্ব-বিপ্লব সৃষ্টির ইহা অপরিহার্য্য অঙ্গ। যে কোন গৃহযুদ্ধে বিশেষ করিয়া জাতীয়তাবাদী—কম্যুনিষ্ট পন্থীদের সংঘর্ষে ইন্ধন প্রদান সোভিয়েটের স্বধর্ম্ম—নৈতিক দিক হইতে বাধ্যও বটে। সুতরাং স্বতঃই চীনের গৃহযুদ্ধে ইন্ধন যোগাইবার অভিযোগ ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধে জোড়ালো হইয়া উঠে। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক এবং কম্যুনিজমের বিরোধী। এই অবস্থায় বিশ্বের যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিপন্ন বিশেষ করিয়া বিরুদ্ধ পক্ষ কম্যুনিষ্ট শক্তির দ্বারা যে কোন ভাবে

আক্রান্ত হইলে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া গণতন্ত্রকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। অতীতে অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের উল্লিখিত নৈতিক চেতনাবোধের জলন্ত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে; চীনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় তাহারা এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ ও সক্রিয়। কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে, চীনের গৃহযুদ্ধে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রদ্বয়ের ভূমিকা অত্যন্ত ঘোরালো। ইঙ্গ-মার্কিন নীতিতে সদিচ্ছার অভাবের নির্লজ্জতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মহাচীনের জাগরণ ও সংগঠন প্রচেষ্টাকে প্রতি পদে ব্যাহত করিয়া ইঙ্গ-মার্কিন কায়েমী স্বার্থের বাজার বজায় রাখা তাঁহাদের অভ্রান্ত লক্ষ্য।

জাপান

জাপান ভারতের সীমান্তবর্ত্তী রাষ্ট্র না হইলেও ভারতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে ইহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য্য। দ্বিতীয় পুঁজিবাদী মহাসমরে এশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বের অন্যতম প্রধান শক্তি জাপান বিধ্বস্ত হইবার বিষয় আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্ত্রের ফলে জাপ শক্তির পুনরুভ্যথানের সম্ভাবনা যে নাই ইহার স্বপক্ষেও আমি প্রবল যুক্তিসমূহ উত্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি। সেই প্রসঙ্গে অবশ্য আমি ইহাও উল্লেখ করিয়াছি যে, জাপান অন্যতম বিশ্বরাষ্ট্র শক্তিরূপে পরিণত না হইলেও কতক কারণে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইবার আশা আছে। ইহার প্রথম কারণ জাপানের ন্যায় প্রাণবন্ত একটি জাতিকে নির্ব্বীর্য্য রাখা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়ত ইঙ্গ-মার্কিণ স্বার্থের প্রয়োজনে জাপানকে খানিকটা শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। চীনে কম্যুনিষ্ট প্রভাব বৃদ্ধি ইঙ্গ-মার্কিণ স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আবার ইহাও সত্য যে চীনের কাঁচা মাল ও প্রচুর

খনিজসম্পদ লাভের সঙ্গে সঙ্গে জাপান চীনসহ এশিয়ার বিরাট বাজারে ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠুক ইহাও তাঁহাদের মোটেই কাম্য নহে।

ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃপক্ষের যুদ্ধপূর্ব্বকালীন নীতি বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, চীনের কম্যুনিষ্টদল মারফত সোভিয়েট সম্প্রসারণ নীতির বিরুদ্ধে অর্থাৎ বিশ্ববিপ্লব সৃষ্টির পথে প্রবল একটা প্রতিপক্ষ দাঁড়া করিবার উদ্দেশে তাঁহারা চীনের স্বার্থকে খানিকটা বলি দিয়া জাপানকে তথায় অনেকটা সুদৃঢ় করিবার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহারা চীন-জাপান সংগ্রাম এবং জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখলকে মৌন সমর্থন জানাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে যে তাঁহাদের জাপ-তোষণ নীতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট তাহা বলা বাহুল্য। এই অবস্থায় স্বতঃই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, পীতাতঙ্ক গ্রস্ত শ্বেতাঙ্গ পুঁজিবাদ রুশাতঙ্ক দূর করিবার জন্য বিধ্বস্ত জাপানকে পুনরায় অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করিবে কি? চীনের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী অর্থাৎ বিভিন্ন রণাঙ্গণে চীনা জাতীয় বাহিনীর শোচনীয় বিপর্য্যয়ের ফলে ইঙ্গ-মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষকে এক্ষণে অতি দ্রুত তাঁহাদের পররাষ্ট্রনীতি বিশেষ করিয়া চীন ও জাপান সম্পর্কিত নীতি পূর্ণবিবেচনা করিতে হইবে।

চীনের জাতীয় বাহিনীর এই বিপর্য্যয়ের মূল কারণ সম্পর্কে বৃটিশ ও মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষের ভ্রান্ত প্রচারণার ফলে বিশ্ব নরনারী সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত। বিশ্ববাসীর দৃঢ় বিশ্বাস ইহা সোভিয়েট ইঙ্গিতে পরিচালিত কম্যুনিষ্ট দলের সাফল্য। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা মোটেই তাহা নহে। চীনে মুখ্যত তিনটি রাজনৈতিক দল বর্ত্তমান। (ক) 'প্রতিক্রিয়াশীল চীনা খৃষ্টান সম্প্রদায়ের পোষণে চিয়াং কাইশেক দ্বারা পরিচালিত তথাকথিত জাতীয়তাবাদী দল (খ) মাদাম সান ইয়াৎ সেন এর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রগতিবাদী চীনা জাতীয় দল (গ) মাউ সে তুং পরিচালিত সোভিয়েটপন্থী কম্যুনিষ্ট দল।

দ্বিতীয় মহাসমরের পূর্ব্ববর্ত্তী কালে চিয়াং ও মাদাম সানিয়াৎ সেন দলের সহিত কম্যুনিষ্ঠ দলের বিরোধ ও সংঘর্ষ চলিয়াছিল। জাপ-আক্রমণ, দ্বিতীয় মহাসমর ইত্যাদির ফলে ত্রিদলীর চুক্তির ভিত্তিতে জাপ-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহা সমরের কদর্য্যতার মধ্য দিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ পুঁজিবাদী স্বার্থের চক্রান্ত অত্যন্ত নগ্ন হইয়া উঠে এবং ইহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে মাউ সে তুং ও মাদাম সানিয়াৎ সেন দলের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঙ্গ-মার্কিণ পুঁজিবাদের তাঁবেদার চিয়াং একক হইয়া পড়েন এবং এই কারণে পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইতেছেন।

এই অবস্থায় দেখা যায়, ইঙ্গ-মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষের সম্মুখে তিনটি পথ উন্মুক্ত। (১) চীন বিভাগ স্বীকার, (২) জাপানকে অস্ত্রসজ্জার অধিকার দান, (৩) চীনের পক্ষ হইয়া ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর অস্ত্রধারণ অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্ব মহাসমর।

চীন বিভাগ স্বীকৃতির সুদূর প্রসারী ফল যে কিরূপ মারাত্মক তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। ইহাতে শুধু যে চীন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে পরিণত হইবে তাহা নহে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট শক্তি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নবীন প্রেরণায় অত্যুগ্র হইয়া উঠিবে। ইহাতে ইন্দোচীন, শ্যাম, ইন্দোনেশীয়া, ব্রহ্ম, সিংহল ইত্যাদি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিই যে শুধু ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে তাহা নহে, নবগঠিত পাকিস্থান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্বও অতি দ্রুত বিপন্ন হইয়া পড়িবে। দীর্ঘকাল পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণের অভিশাপ জর্জ্জরিত এবং প্রতিক্রিয়াশীলতায় শতভাবে নিপীড়িত দেশগুলিতে অতি দ্রুত উল্লিখিতরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক—স্বতঃসিদ্ধ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং চীন বিভাগ স্বীকৃতি পুঁজিবাদের পক্ষে আত্মঘাতী হইতে বাধ্য।

দ্বিতীয় উপায় জাপানকে অস্ত্র সজ্জার অধিকার প্রদান। ইহা যে প্রাচীন নীতি তাহাও আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অবশ্য ইহাও সত্য যে, বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জাপান পরাজিত রাষ্ট্র, শিল্প বাণিজ্য, সমরশক্তি ইত্যাদি সব কিছুই বিধ্বস্ত। তবে ইঙ্গ-মার্কিন সহযোগিতায় জাপ সমরশক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ সম্ভব। এই ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথম প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, জাপানের ন্যায় একটি শিল্প-নিপুণ রণকৌশলী রাষ্ট্রকে লইয়া ইঙ্গ-মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষ পুনরায় একটি রাজনৈতিক জুয়ায় প্রবৃত্ত হইবেন কি? প্রথম বিশ্ব মহাসমরে ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন স্বার্থের পরম শত্রু জার্ম্মাণী পরাজিত হইলেও রুশিয়া রূপ একটি বিরাট রাষ্ট্রে একটা যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি হইয়া বিশ্বের পুঁজিবাদকে সশঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। জার্ম্মাণ পরম শত্রু হইলেও পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, কাজেই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তাহার শত্রুতা মাত্রা অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়া পুঁজিবাদী স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই কারণে সোভিয়েট রুশিয়ার সম্প্রসারণ পথে প্রবল প্রতিবন্ধক সৃষ্টির জন্য ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্ত নাৎসী হিটলারকে জার্ম্মাণীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ইহা সর্ব্বজন বিদিত। হিটলার এই সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিয়া প্রাচীনতম শত্রু ফ্রান্সকে পদানত করিবার পন্থা অনুসরণ করিলেন। ইহাই দ্বিতীয় মহাসমরের ভূমিকা। হিটলারের কূটনীতি অনুধাবন করিলে দেখা যায়, ফ্রান্স জয়ের জন্য তিনি পরম শত্রু রুশিয়ার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নাই। তিনি হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, সোভিয়েটের সহিত অনাক্রমণাত্মক চুক্তি করিয়া ফ্রান্স জয় সহজ হইবে, বাস্তব পক্ষে তাহা সম্ভবও হইয়াছিল। ফ্রান্স পরাজিত হইলে সমগ্র ইউরোপ জার্ম্মাণ পদানত হইবে এবং সেই অবস্থায় বৃটিশ তাঁহার সহিত আপোষ মীমাংসা করিতে বাধ্য হইবে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ফরাসী স্বার্থ বাদ দিয়া বৃটিশ জার্ম্মাণীর সহিত মৈত্রী স্থাপনে সহজে সম্মত হইবে।

এই কারণে, ফ্রান্স ও অল্প কয়েকদিনের মধ্যে ইউরোপ জয়ের পর হিটলার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ না করিয়া বিমান আক্রমণ ভীতি দ্বারা ইংলণ্ডকে সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। বৃটিশ ইহাতে বিচলিত হয় নাই। তাঁহাদের কূটনীতি ভিন্ন পথে পরিচালিত হইল। তাঁহারা রুশ-জার্ম্মাণ চুক্তি ব্যর্থ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সংগ্রামে অবতীর্ণ করাইবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। এদিকে হিটলার প্রথম কিস্তিতে মাৎ করিতে সমর্থ না হইয়া বৃটিশের প্রতি স্বীয় সদিচ্ছার ভাব সপ্রমাণের উদ্দেশে সোভিয়েট রুশিয়ার উপর আক্রমণ চালাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় বিশ্বস্ত অনুচর হের হেসকে একক শত্রুরাজ্যে প্রেরণ করিলেন। ইহার উদ্দেশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট—ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী ছিন্ন করিয়া ইঙ্গ-জার্ম্মাণ মৈত্রী বন্ধন দৃঢ় কর—পুঁজিবাদের প্রধান শত্রু সোভিয়েট রুশিয়ার ধ্বংসের ভার আমি গ্রহণ করিব। অনেকেই আমার এই অভিমত নিছক কল্পনা বলিয়া মনে করিবেন। হিটলার জীবিত নাই, হের হেসের কণ্ঠরুদ্ধ—কাজেই হের হেসের বিমান যোগে একক লণ্ডন গমনের রহস্য চিরকাল অজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের এই রহস্য উদ্ঘাটনের ক্ষমতা থাকিলেও ইহা তাঁহাদের তরফ হইতে বিশ্বের সমক্ষে প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কাজেই আমার অভিমতকে সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা অকাট্য করা সম্ভব নহে। কিন্তু কূট রাজনীতিবিদের পক্ষে উল্লিখিত রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া মারাত্মক ভুল হইবে।

উল্লিখিত কারণেই আমার প্রশ্ন এই যে, সোভিয়েট রুশিয়াকে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ইঙ্গ-মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষ জার্ম্মাণীর ন্যায় পুনরায় জাপানকে অস্ত্রসজ্জিত করিবার রাজনৈতিক জুয়ায় প্রবৃত্ত হইবেন কি? হিটলার সৃষ্টির তিক্ত অভিজ্ঞতার পর তাঁহারা পুনরায় সে নীতি অনুসরণ করিবেন কি? পুঁজিবাদী দর্শনশাস্ত্র বিচার করিলে দেখা যায়, প্রতিক্রিয়াশীলতাকে সযত্নে জিয়াইয়া রাখা সে তত্ত্বকথায় প্রাণবন্ত। সুতরাং তিক্ত হইতে তিক্ততর

অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ভয়ে তাঁহারা কোন কারণেই সঙ্কুচিত অথবা বিচলিত হইবেন না ; ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ইহার স্বপক্ষে আরও একটি যুক্তি উত্থাপন চলে যে, যুদ্ধোত্তর বিশ্বে ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজি অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া আমি পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিতেছি। এইরূপ একচেটিয়া অধিকার লাভ করিলেও দেখা যায়, সমগ্র বিশ্বের চাহিদা পূরণ তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। কাজেই অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী দোসর তাঁহাদের প্রয়োজন। এই দোসর নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁহাদের জার্ম্মাণী ও জাপান এই দুইটি রাষ্ট্রের একটিকে গ্রহণ করিতে হইবে।

জার্ম্মানীকে লইয়া রাজনৈতিক জুয়ায় প্রবৃত্ত হওয়ার মারাত্মক পরিণতির বিষয় আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি ; সেই পরীক্ষায় ইহাও দেখা গিয়াছে যে, তৎফলে ধ্বংসের বীভৎসতায় ইউরোপের বুকই মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত এবং শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান জাতি ও পুঁজিবাদীদল সর্ব্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুতরাং জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত হইতে দেওয়া চলে না।

জাপানকে সে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইলে সোভিয়েট-বিরোধী সংগ্রাম এশিয়ার বুকেই সর্ব্বাধিক মারাত্মক আকার ধারণ করিবে এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের দেশগুলিতে জাগরণ ও সংগঠনের নবীন প্রেরণা পদে পদে কার্য্যকরভাবে ব্যাহত হইবে। ইত্যবসরে বিধ্বস্ত ইউরোপ সংগঠন এবং খৃষ্টান পুঁজিবাদকে অধিকতর শক্তিশালী করিবার সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া যাইবে।

সুতরাং দেখা যায়, ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থের প্রয়োজনে অপরানুগ্রহ পুষ্ট জাপানের লুপ্ত গৌরব খানিকটা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা বিদ্যমান। এইভাবে জাপান শক্তিশালী হইয়া উঠিলে এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রসম্পর্কে তাহার মনোভাবও নীতি কিরূপ হইবে ইহার আলোচনা প্রয়োজন।

প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই সোভিয়েট সম্প্রসারণ নীতি ব্যাহতের জন্যই জাপানকে শক্তিশালী করিবার নীতি অনুসৃত হইবে। কাজেই আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, সোভিয়েট সাহায্য পুষ্ট চীনের কম্যুনিষ্ট শক্তির সহিত সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে জাপানের সর্ব্বাধিক শক্তি ব্যয়িত হইবে। কারণ ইহাতে আদর্শের সংঘাত ব্যতীত, রুশ-জাপান অতি প্রাচীন বৈরীতাও নূতন প্রেরণা লাভ করিবে। রুশ ও জাপান উভয় পক্ষের ইহা জীবন মৃত্যু সংগ্রাম বলিয়া এই সংগ্রামের ব্যাপকতা ও প্রচণ্ডতা ভয়াবহ আকার ধারণ করিতে বাধ্য। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উক্ত সংগ্রাম ইঙ্গ-মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষের ষড়যন্ত্র অনুসারে পরিচালিত হইবে বলিয়া উভয় পক্ষকে পঙ্গু করিবার স্পৃহা নানাভাবে প্রকাশ পাইবে। অর্থাৎ সংকটকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার জন্য ইঙ্গ-মার্কিন কূটনীতি সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট থাকিবে। এই অবস্থায় জাপানের পক্ষে এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্র অথবা প্রশান্ত মহাসাগরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ করা সম্ভব হইবে না। তবে এই সুযোগে জাপান চীনের সহযোগিতায় এশিয়ায় বৌদ্ধ রাষ্ট্রসংহতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিলে সে আন্দোলন অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। এই ক্ষেত্রে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে, চীন-জাপান ঐক্য ও সহযোগিতা সম্ভব কি? যুদ্ধ পূর্ব্বকালে জাপান ঐরূপ ঐক্য ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার জন্য নানাভাবে সচেষ্ট ছিল। শেষ পর্য্যন্ত অস্ত্রবলও প্রয়োগ করিয়াছিল; কিন্তু চীনা রাষ্ট্রধুরন্ধরগণ জাপ মিতালীকে কোন ক্রমেই আমল দেন নাই। বৃটিশ ও মার্কিন পুঁজিকে চীনে অবাধ অধিকার প্রদত্ত হইলেও জাপ পুঁজিকে চীনা রাষ্ট্রনায়কগণ গ্রহণ করিতে মোটেই প্রস্তুত নহেন। প্রতিবেশীর প্রতি এইরূপ মনোভাব প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত বিস্ময়কর। স্বদেশ সংগঠন ক্ষেত্রে বৈদেশিক পুঁজির প্রয়োজন যে ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য সেই অবস্থায় ভৌগোলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক হইতে ঘনিষ্ঠতরের

সহিত বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সকল দিক হইতে নিরাপদ ও লাভজনক। এই দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, চীন সংগঠনের প্রয়োজনে ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিকে অধিকার না দিয়া জাপ পুঁজিকে সুযোগ দেওয়া হইলে শুধু চীনের নহে—সমস্ত এশিয়ার রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করিত। ইঙ্গ-মার্কিন খৃষ্টান পুঁজিবাদ আজ বিশ্বের অবশিষ্ট নরনারীর সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি—সর্ব্বোপরি জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিবার দুঃসাহস লাভ করিত না।

জাপানের ভবিষ্যতের বিষয় আরও গভীরভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায়, আণবিক বোমা বিধ্বস্ত জাপ-শক্তি কম্যুনিষ্ট বিরোধী সংগ্রামে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইবার সুযোগে আত্মপ্রতিষ্ঠার অধিকার লাভ করিলেও তাঁহাদের পক্ষে প্রতিবেশী এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির প্রতি বৈরী ভাব পোষণ অদূরদর্শিতা হইবে। জাপান ঐরূপ মনোভাব অথবা নীতি অনুসরণ করিলে স্বীয় ধ্বংসের পথ সরল হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে অশ্বেতজাতির বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ পুঁজির ষড়যন্ত্র পরোক্ষ সমর্থন-লাভ করিয়া সবল ও বেগবতী হইয়া উঠিবে। এই কারণে জাপ নরনারীকে গভীর দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার সহিত সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির প্রতি প্রতিবেশীসুলভ দরদী মনোভাব লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ইহার ফলে শুধু জাপ নরনারীর নহে, এশিয়ার প্রত্যেকটী অধিবাসীর মুক্তি ও স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে এবং শ্বেতাঙ্গ পুঁজিবাদী চক্রান্ত ব্যর্থ হইবে। যে কোন দিক হইতে যে কোনরূপ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলে শিল্পবিজ্ঞানপ্রধান জাপানের উল্লিখিতরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয় অস্বীকার করা চলে না। সুতরাং জাপ নরনারী এই স্থূল সত্যকে উপলব্ধি না করিলে অথবা ইহা সম্যকভাবে

উপলব্ধি করিয়াও ভিন্ন মত এবং পথ গ্রহণ করিলে অগাধ সলিলে মগ্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধিকেও শতভাবে বিপন্ন করিবে।

চীন ও জাপানকে বাদ দিলে উত্তর, উত্তর-পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক হইতে ভারতের উপর আক্রমণ চালাইবার ন্যায় শক্তিশালী রাষ্ট্র আর নাই। উল্লিখিত রাষ্ট্রদ্বয় সম্মিলিত অথবা একক আক্রমণ চালাইবার ক্ষেত্রে শ্যাম, ব্রহ্ম অথবা ক্ষুদ্র সিংহল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। এই ক্ষেত্রে ব্রহ্ম এবং সিংহলের স্থান অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দিক হইতে একমাত্র বৌদ্ধরাষ্ট্র-সংহতির ফলে উল্লিখিত দুইটী ক্ষুদ্র বৌদ্ধ দেশখণ্ড ভারত জয়ের পথকে সুগম করিয়া তুলিবার ক্ষেত্রে অপ্রতিহত হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এই অবস্থায় স্থলভাগে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত পথ অপেক্ষা ভারত মহাসাগর ও ইহার বঙ্গোপসাগর অঞ্চল সর্ব্বাধিক বিপন্ন হইবে। ইহার অর্থ এই যে, স্থলবাহিনীর আক্রমণ অপেক্ষা নৌ-বাহিনীর আক্রমণ প্রচণ্ড এবং মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইবে। এই কারণে উল্লিখিত রাষ্ট্রদ্বয়ের সহিত সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিকে বিশেষ ভাবে কাজে লাগাইতে হইবে। অবশ্য ইহাও অতীব সত্য যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক হইতে ভারতের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ব্রহ্ম ও সিংহল বৈরীভাবাপন্ন হইতে পারে না। সম্প্রসারণ অর্থাৎ রাজ্য বিস্তারের কোনরূপ নীতি গ্রহণ অথবা মনোভাব পোষণ সিংহলের পক্ষে বাতুলতা। ব্রহ্মের রাষ্ট্রনায়কগণের পক্ষে রাজ্য বিস্তারের ক্ষীণ আশা পোষণ সম্ভব বটে; তবে তাঁহাদের দৃষ্টি মুখ্যতঃ শ্যাম ও মালয়ের দিকে নিবদ্ধ থাকিবে। তাঁহারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি বিস্তার না করিয়া পূর্ব্বপাকিস্থানের অংশবিশেষ দখলের জন্য হয়ত সুদূর ভবিষ্যতে সচেষ্ট হইবেন। ইহাও সত্য যে

উল্লিখিতরূপ আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য তাঁহারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় রাখার নীতি অনুসরণ করিবেন। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্ম-পাকিস্থান বর্ত্তমান সম্পর্ক কিরূপ এবং ভবিষ্যতে ইহা কি আকার ধারণ করিতে পারে ইহাও আমাদের বিচার্য্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। এক হস্তে তরবারী এবং অপর হস্তে কোরাণ লইয়া অভিযান চালাইবার মন্ত্রে দীক্ষিত ইসলামিক সভ্যতা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ অর্থাৎ বৃটিশ ব্রহ্ম দখলের পর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার কয়েকটি অঞ্চলে এক হস্তে কাস্তে ও অপর হস্তে কোরাণ লইয়া অভিযাত্রী সাজিবার বিষয় আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইহারা ব্রহ্মদেশেই সর্ব্বাধিক উৎপাত সৃষ্টি করিয়াছিল। কৃষি শ্রমিক, জাহাজী শ্রমিক ও খনি শ্রমিক হিসাবে তাহারা ব্রহ্মে গমন করিয়া শুধু যে ব্রহ্মের অর্থনৈতিক জীবনে একটা বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা নহে, উদার বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্রহ্মের সামাজিক জীবনকে মারাত্মকভাবে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। ইসলাম বহু বিবাহের সমর্থক। ওদিকে ব্রহ্মে স্ত্রী স্বাধীনতা বিদ্যমান এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে পুরুষদের মধ্যে প্রব্রজ্যা গ্রহণের মোহ অত্যধিক। ইহার ফলে নারীদের বিবাহ সমস্যা অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য এই সমস্যা নূতন নহে। কিন্তু বহিরাগত—বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশীয় মুসলমানগণ ইহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। অল্প কিছুদিনের মধ্যে ব্রহ্ম মহিলার বাঙালী মুসলমান স্বামী গ্রহণের সংখ্যা অত্যাধিক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মের সামাজিক জীবনকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার ফলে আরাকান বিভাগের অধিকাংশ পল্লী সমৃদ্ধ মুসলমান উপনিবেশে পরিণত হইয়াছিল। কারণ মুসলমানদের বহু বিবাহ-নীতির ফলে সন্তান সংখ্যাই যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা নহে, ব্রহ্ম নারী পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী এবং তাঁহাদের গর্ভজাত সন্তান সম্পত্তির মালিক বলিয়া ব্রহ্মের বহু

পরিমাণ ভূ-সম্পত্তি মুসলমান স্বামীর দখলে চলিয়া যায়। সন্ত দখলকৃত রাজ্যশাসন ও দেশবাসীদের শায়েস্তা করিবার জন্য বৃটিশ কর্ত্তৃক অনুসৃত নীতিও যে ইহাতে নানাভাবে ইন্ধন প্রদান করিয়াছিল ইহা বলা বাহুল্য।

এইভাবে সমগ্র ব্রহ্ম মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হইবার আশঙ্কায় সশঙ্কিত হইয়া ব্রহ্মের দূরদর্শী বিপ্লবী নেতা ভিক্ষু উত্তম ইহার বিরুদ্ধে একটা প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় নেতার প্রতি বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের তীব্র বিরূপ মনোভাব ততোধিক তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সেই আন্দোলন ব্যাপক ও জোড়ালো হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ব্রহ্মের জনসাধারণ সমস্যার স্বরূপ এবং ইহার সুদূর প্রসারী ফল হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে মুসলমানদের সহিত ব্রহ্মবাসীদের কয়েকবার বড় রকমের সংঘর্ষ হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাসমরে ব্রহ্ম জাপ কবলিত হইবার সূচনাতে ভারতীয়দের ব্রহ্মত্যাগ আরম্ভ হয়। ইহাতে বহু সংখ্যক মুসলমান ব্রহ্ম ত্যাগ করিয়াছে। আরও জানা যায়, সেই সময় ব্রহ্মের মুসলমান বিদ্বেষী কয়েকটি রাজনৈতিক দলের কার্য্যকলাপের ফলে বহু মুসলমান নিহত ও উদবাস্তু হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও মুসলমান সমাজ হীনবল হয় নাই অর্থাৎ ব্রহ্মকে মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করিবার দুরাশা তাঁহারা ত্যাগ করেন নাই। ভারত বিভাগ ও বৃটিশের ব্রহ্ম ত্যাগের কালে পূর্ব্ব পাকিস্থান সীমান্তবর্ত্তী আরাকানের একটা বিরাট অংশ পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিবার নির্লজ্জ দাবী উত্থাপন করিতে লীগ দ্বিধাবোধ করে নাই। ব্রহ্মের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী আউঙ সানের হুমকিতে তাঁহারা অবশ্য বেশী হৈ চৈ করিতে সাহস পান নাই। কিন্তু তাঁহাদের সাম্প্রতিক কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিলে পরিষ্কার বুঝা যায় পাকিস্থানী নেতাদের সেই লোলুপতা সবল ও সক্রিয়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি যাঁহারা

লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে ভীত ও লজ্জিত নহে, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মের অঞ্চল বিশেষ গ্রাস করিবার ইচ্ছা পোষণ খুবই স্বাভাবিক।

আমাদের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তের রাজনৈতিক বিষয় সমালোচনা কালে দেখা যায়, ভারত মহাসাগরের প্রান্ত সীমায় অবস্থিত অষ্ট্রেলিয়া ও ওলন্দাজ পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অষ্ট্রেলিয়া সমগ্রভাবে একটি বৃটিশ উপনিবেশ। কাজেই রাজনৈতিক দিক হইতে ইহার স্বতন্ত্র সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুতরাং বৃটিশকে বাদ দিয়া অষ্ট্রেলিয়ার রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয় আলোচনা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

ইন্দোনেশীয়া একটি ওলন্দাজ উপনিবেশ হইলেও ইদানীং ইন্দোনেশীয়গণ স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন। ডাচ শাসন ও শোষণ মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হইলেও দেখা যায়, ঐরূপ একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত মোটেই সম্ভব নহে। বরঞ্চ তাঁহারা ভারতের সহিত মৈত্রী-সূত্রে আবদ্ধ থাকিবার জন্যই উন্মুখ থাকিবেন। ইন্দোনেশীয়ার মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই কারণে দেখা যায়, মুক্তি-আন্দোলন বর্ত্তমানে মুসলমান নেতৃত্বে পরিচালিত হইতেছে। ইন্দোনেশীয়ার পক্ষে একক ভারত বিরোধী নীতি অনুসরণ যে সম্ভব নহে তাহা আমি একটু পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। একমাত্র মুসলিম রাষ্ট্রসংহতি আন্দোলনের সহিত ইন্দোনেশীয়ার মুসলমান সমাজ জড়িত হইলে ইন্দোনেশীয়ার সামারিক গুরুত্ব বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে। কারণ ভারতমহাসাগর অবরোধের ক্ষেত্রে ইন্দোনেশীয়ার স্থান অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভারতমহাসাগর প্রহরার ভারতীয় ঘাঁটি আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ইহার অতি নিকটে অবস্থিত। জাভা, সুমাত্রার ঘাঁটি হইতে আন্দামানে অবস্থিত ভারতীয় নৌবহরকে বিপন্ন করা সহজসাধ্য। ইন্দোনেশীয়ার নৌবহর অতি সহজে বঙ্গোপসাগর

অঞ্চলে নানাবিধ উৎপাত সৃষ্টি করিতে পারিবে। ইন্দোনেশীয়া ডাচ অধীনে থাকিলে ইহার উল্লিখিত গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইবে। কারণ স্বাধীন ইন্দোনেশীয়ার সহিত ভারতের মৈত্রীবন্ধন স্থাপিত হওয়া এবং উহা অটুট থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু পরাধীন ইন্দোনেশীয়া চিরকাল ভারতীয় স্বার্থের বিরোধী থাকিবে এবং আপৎকালে চরম শত্রুতা সাধনের জন্য সচেষ্ট হইবে অথবা ভারতের শত্রুকে যাবতীয় সুযোগ প্রদান করিতে কোনরূপ দ্বিধা প্রকাশ করিবে না। ইউরোপের কোন রাষ্ট্রের সহিত ভারতের বিরোধের ফলে সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ হইলে ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ যে অবশ্যই ইউরোপীয় শক্তিকে সমর্থন করিবেন, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

পূর্ব্ব পাকিস্থানের আলোচনা ভারতের পশ্চিম সীমান্তের সহিত যুক্তভাবে করা প্রয়োজন।

পাকিস্থান

বৈদেশিক স্বার্থের কূট চক্রান্তে ভারতকে খণ্ডিত করিয়া পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। ইসলাম বিপন্নের ধ্বনি তুলিয়া মুসলিম লীগ ভারত বিভাগের দাবী তুলিয়াছিল। বৃটিশ পুঁজিবাদী স্বার্থ বিভিন্ন ভাবে উল্লিখিত দাবীকে সংহত ও সুগঠিত করিয়া তুলিয়া শেষ পর্য্যন্ত বিশাল ভারতকে খণ্ড বিখণ্ডিত করিয়াছে। ইহা ভারতবাসী মাত্রেরই সুপরিজ্ঞাত।

অখণ্ড ভারতে ভারতীয় মুসলমান সমাজ সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিল এবং এই কারণে তাঁহারা ইসলাম বিপন্নের ধ্বনি তুলিয়া ভারত বিভাগ দ্বারা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ অর্থাৎ স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের দিক হইতে ইহা বিরাট সাফল্য। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে :—

(১) ঈপ্সিত স্বতন্ত্র রাষ্ট্র লাভ করিয়া মুসলিম লীগ শান্তিপূর্ণ ভাবে স্বীয় রাষ্ট্রগণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া তৃপ্ত হইবে কি?

(২) ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রের অংশ বিশেষ এমন কি সমগ্র ভারত ভূমিতে মুসলিম প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার মনোভাব পাকিস্থানী মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জাগরূক আছে কি?

উল্লিখিত প্রশ্ন দুইটি আমাদের যাবতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে গভীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিতে হইবে। বৈদেশিক স্বার্থের কূটচক্রান্তে যে ভাবে দেশ বিভাগের দ্বারা পাকিস্থান গঠিত হইয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, শিল্প ও অর্থনৈতিক দিক হইতে উহা একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে না। উৎপাদন শক্তির উপরই দেশের সমৃদ্ধি সর্ব্বতোভাবে নির্ভরশীল। উৎপাদন দ্বিবিধ—কৃষি ও খনিজ। কয়েকটি বাঁধ ও খাল খনন করিয়া পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধুর বিরাট অঞ্চল কৃষিযোগ্য করা হইয়াছে। উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলিকে আরও উন্নততর করিয়া কৃষি উৎপাদন শক্তি কিছুটা বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে এবং ইহাতে হয়ত অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটিবে। কিন্তু রপ্তানীর পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করা মোটেই সম্ভব হইবে না। সেচ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি বিধান সত্ত্বেও আবাদযোগ্য ভূমির পরিমাণ খুব বেশী বৃদ্ধি করা চলিবে না। কারণ মোট ভূমির পরিমাণ কম। ইসলাম বিপন্নের ধুয়া তুলিয়া স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হইবার ফলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান তথায় চলিয়া গিয়াছেন—ভবিষ্যতে আরও বহুলোক চলিয়া যাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা বিদ্যমান। এই কারণে ভূমির আনুপাতিক হারে লোক সংখ্যা অত্যধিক হইয়া দাঁড়াইবে। বহু বিবাহ ধর্ম্মের অঙ্গ গণ্য হইবার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে জনসংখ্যাদ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিবে। পূর্ব্ব পাকিস্থানের কৃষি সম্পদের মধ্যে পাট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পাকিস্থানে খনিজ সম্পদ নাই বলিলেই চলে। যান্ত্রিক শিল্পের যুগে শিল্প মুখ্যতঃ কয়লা, লৌহ ও তৈলের উপর নির্ভরশীল। এই অবস্থায় দ্বিধাহীন ভাবে বলা চলে যে, পাকিস্থানের শিল্পের ভবিষ্যত উজ্জ্বল ত' নহে, অধিকন্তু কুটির শিল্পের পর্য্যায় অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে অস্তিত্ব বজায় রাখিবার প্রয়োজনে পাকিস্থানকে সমর-শিল্প, জাহাজ-শিল্প ও সাধারণ-শিল্পের উন্নতি বিধান করিতে হইবে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থানের স্থল যোগাযোগ নাই। একমাত্র আরব সাগর, ভারত মহাসাগর ঘুরিয়া বঙ্গোপসাগর তীরবর্ত্তী পূর্ব্ব-পাকিস্থানে গমনাগমন সম্ভব। এই ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করিতে হইলে নৌ-শিল্প ও নৌ-বল কি পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়। নৌ-শিল্প ও নৌ-বল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দেখা যায়, ইহা সর্ব্বাংশে সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। সমুদ্রপথে বাণিজ্যের প্রসার ঘটিলে নৌ-বাণিজ্যপোত বৃদ্ধি অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই প্রশ্ন দাঁড়ায়, পাকিস্থান সমুদ্রপথে বাণিজ্য সম্প্রসারণ করিতে পারিবে কি? সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করা চলে যে, সে সম্ভাবনা মোটেই নাই। কৃষি ও খনিজ সম্পদহীন পাকিস্থানের পক্ষে বাণিজ্য বিস্তারের বিষয় স্বপ্নেও কল্পনা করা বাতুলতা। সুতরাং শুধু সামরিক প্রয়োজনে নৌ-শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নতি বিধান আর্থিক দিক হইতে শুধু অলাভজনক নহে—সম্পূর্ণ অসম্ভব। সমর-শিল্পের ক্ষেত্রেও উল্লিখিত যুক্তি একান্তভাবে প্রযোজ্য এবং অকাট্য।

সে যাহা হউক, পাকিস্থানের শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থ নৈতিক ভবিষ্যতের বিস্তারিত আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে, উহার ভিত্তিতে পাকিস্থানের সমরশক্তি এবং রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা কি ভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিয়া কোন পথে ধাবিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, ইহাই আমাদের বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপীয় ইতিহাস—বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায়, দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যায় সমগ্র দেশ ধ্বংসোন্মুখ; আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরপুর বেকার যুবসমাজ হতবাক—একটা অংশ বেপরোয়া এবং জলদস্যুতাকে জীবিকারূপে গ্রহণের জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল। এই বেপরোয়া যুবকদের লইয়া গঠিত জলদস্যু দলই আজিকার বৃটিশ শৌর্য্য-বীর্য্য, সম্পদ ও সভ্যতার ভিত্তি। ইহারাই বিশ্বের বিভিন্ন অজ্ঞাত কোণে অভিযান চালাইয়া স্থান বিশেষ দখল ও উপনিবেশ স্থাপন দ্বারা সূর্য্য অস্ত যায় না, এইরূপ একটা বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্য গঠনের ভিত্তি গড়িয়া তুলিয়াছিল। দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা কি ভাবে অদ্বিতীয় সাম্রাজ্য গঠন করিবার প্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছিল ইহা বুঝাইবার জন্যই আমি উল্লিখিত দৃষ্টান্ত প্রদান করিলাম। বিশ্বের ইতিহাসে উহাই যে একমাত্র ঘটনা তাহা নহে—মধ্যপ্রাচ্যের যাযাবর বেদুইন দস্যু দল স্ব স্ব দলীয় সর্দ্দারের অধীনে জলহীন মরু ও চির তুষারাবৃত সুউচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া বহুবার এশিয়া—বিশেষ করিয়া বিশাল ভারতের বুকে হত্যা ও লুণ্ঠনের তাণ্ডব সৃষ্টি করিয়াছিল। তন্মধ্যে অনেকে বিরাট সাম্রাজ্যও গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভারতীয় নর-নারীর পক্ষে সেই ইতিহাস অত্যন্ত শোচনীয়, করুণ ও মর্ম্মন্তুদ।

একটু পূর্ব্বে আমি উল্লেখ করিয়াছি যে, দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা বিশ্বের বিভিন্ন অংশের নর-নারীকে অজানার সন্ধানে ধাবিত হইবার বেপরোয়া প্রেরণায় উজ্জীবিত করিয়াছিল। বাস্তব ক্ষেত্রে কোন কোন দল সত্যিকার সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অপর বহু দল যে সে সংঘাতের বুকে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছেন, ইহাও ঐতিহাসিক সত্য।

এই ভাবে আমরা দেখতে পাই নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক বহু অবস্থার সুযোগে বিশ্বের কতকগুলি রাষ্ট্র ধন, জন, শিল্প ও সম্পদের দিক হইতে শক্তিশালী হইলেও অধিকাংশ রাষ্ট্র কয়েকটি প্রবল রাষ্ট্রের কায়েমী স্বার্থের

চাপে জর্জ্জরিত হইয়া পরমুখাপেক্ষীতাকে রাষ্ট্রিক আশা আকাঙ্ক্ষার চরম পরিণতি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইতেছে। বিশ্বে এই শ্রেণীর বঞ্চিত ও অবনমিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সংখ্যাই অধিক। আকস্মিক দুর্ঘটনার ন্যায় কতক ঘটনাচক্রে কয়েকটি রাষ্ট্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগে শিল্প এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও যে একচেটিয়া অধিকার স্থাপনে সমর্থ হইয়াছে ইহা ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেরই সুপরিজ্ঞাত। ইহাই শাশ্বত অবস্থা, তাহা সপ্রমাণের জন্য উল্লিখিত রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক নেতা, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক সমাজ সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও রাজনৈতিক কূট চক্রান্তের দ্বারা বিশ্বজোড়া গভীর ষড়যন্ত্রের লৌহ জাল বিস্তারের জন্য অনুক্ষণ সবল ভাবে সচেষ্ট।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসমরের ইতিহাসের প্রতি ছত্রে, প্রতিটি অক্ষরে ইহা খোদিত—এমন কি রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যপট, অভিনেতা ও যবনিকা-পাতের মধ্যেও বিশেষ কোন তারতম্য নাই। এই বিরাট শিক্ষা কোনক্রমেই উপেক্ষা করা চলে না। কিন্তু বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, মাত্র একুশটি বৎসরের ব্যবধানের মধ্যে এইরূপ দুইটি মহাসংঘাত প্রত্যক্ষ করিয়াও ভারতীয় মুসলমান সমাজের একটি অংশ স্বেচ্ছায় বঞ্চিত ও ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটাইল! আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার লাভের ভুয়া জিগিরদার অদূরদর্শী নেতাদের জিদ ভারতীয় মুসলমান সমাজকে কি ভাবে ধ্বংসের পথে দ্রুত আগাইয়া দিয়াছে ইহা উপলব্ধি করিতে খুব বেশী দীর্ঘ সময় তাঁহাদের প্রয়োজন হইবে না। কারণ জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম ও মতবাদের কঠোর মারপ্যাচের মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া বিশ্ব নরনারী আজ ক্ষিপ্ত প্রায়। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তাঁহারা এই দূষিত ব্যাধির মূল নির্দ্ধারণ, তাহার প্রতিষেধ আবিষ্কার ও উহা সঠিক ভাবে প্রয়োগের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

এই সকল সুস্পষ্ট লক্ষণ দর্শন করিয়াও পুঁজিবাদী স্বার্থের চক্রান্তে

স্বেচ্ছায় পা বাড়াইয়া দেওয়া আত্মহত্যার পথে অগ্রসর হওয়া নহে কি? ইসলাম বিপন্নের ধূয়া তুলিয়া ধর্ম্মান্ধ মুসলিম নরনারীকে ভ্রান্ত পথে পরিচালনকারী মুসলিম লীগকে এই প্রশ্নের জবাব অবশ্যই দিতে হইবে। আমাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, অতি অল্পদিনের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়া স্বতঃই উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর কঠোর বাস্তব রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া সম্ভব। এক হস্তে কোরাণ ও অপর হস্তে তরবারি লইয়া ধাবিত হওয়া হজরত মহম্মদের নীতি বা ধর্ম্মমত এবং ইসলামেব ইতিহাস এই কাহিনীরই ধারাবাহিক বিবরণ।

তবে ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মহম্মদের শিষ্যগণের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্ব-প্রথম ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের উল্লিখিত অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইলে ইতিহাসকে অস্বীকার করা হয়। কারণ দাক্ষিণাত্যে ইসলাম সভ্যতা বিস্তার লাভের কাহিনীর মধ্যে তরবারির ঝনৎকার নাই। তৎকালে ভারতে আগত কোন বিশিষ্ট মুসলমানের একটি উক্তি কিম্বদন্তীর ন্যায় প্রচলিত। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভারতের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া নাকি উল্লেখ করিয়াছিলেন, 'ভারত এমন দেশ যে জঙ্গলে উৎপন্ন এক শ্রেণীর বৃক্ষের মধ্যে খাসা দুইখানি রুটি ও এক গ্লাস সরবৎ পাওয়া যায়।' এই অকপট প্রচারণা ধূ ধূ মরুবুকের যাযাবর নরনারীর জীবনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা পরবর্ত্তী কালের ঘটনাবলীর মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মধ্য প্রাচ্যের যাযাবর অর্দ্ধমানব গোষ্ঠি যে সু-প্রাচীন, সুসভ্য, শান্তিপ্রিয় এবং আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে বিশ্ব-জন-নমস্য, ত্যাগ ও তিতিক্ষাব্রতী নরনারীর উষ্ণ শোণিতে এই পবিত্র ভূমির ধূলিকণা বহুবার কর্দ্দমাক্ত করিয়া তুলিয়াছিল ইহা সর্ব্বজনবিদিত। এ করুণ ও মর্ম্মন্তুদ কাহিনী ভারতীয় নরনারী ভুলিতে পারেন না।

সুজলা সুফলা শস্তশ্যামলা ভূখণ্ডের শান্তিপ্রিয় তিতিক্ষাব্রতী নরনারীর অরক্ষিত গৃহকোণে সঞ্চিত ধনসম্পদ লুণ্ঠনকারী যাযাবর দস্যুদল কিভাবে এদেশে সাম্রাজ্য-বিস্তারের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহার বিশদ আলোচনা এই ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য নহে। আমি শুধু এইটুকু উল্লেখ করিব যে, মানব মনের ক্ষমতাপ্রিয়তা এবং পার্থিব ভোগস্পৃহা পূরণের উদ্দেশ্যে শাসন ও শোষণ চালাইবার যে উন্মত্ততা সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয়, মুসলমানদের মধ্যে তাহা বিশেষ পরিস্ফুট ছিল না। এ দেশের ধর্ম্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা তাঁহাদের মূল লক্ষ্য ছিল। এই কারণে তাঁহারা এদেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র উপাসনা মন্দির এবং গৃহ ও সমাজ জীবনের শুচিতা ও পবিত্রতা রক্ষাকারী নারী সমাজের উপর সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর ও নির্দ্দয় হস্তে আঘাত চালাইয়াছিলেন। ইহা না হইলে মন্দির ও চৈত্য ভাঙ্গিয়া উহারই মাল-মসলা দিয়া মসজিদ নির্ম্মাণ এবং হিন্দু নারী হরণ ও ধর্ম্মান্তরিত করণ বীরত্ব-ব্যঞ্জক, পবিত্র ও পুণ্যকাজ বলিয়া মুসলমান সমাজে গণ্য হইত না। তাহাদের মনের এই আদিম মনোভাব যে অদ্যাবধি দূরীভূত হয় নাই তাহা দেশ বিভাগের পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তীকালে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বাঙালার বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মুসলমান কর্ত্তৃক দলবদ্ধভাবে হিন্দু নারী হরণ অথবা ধর্ষণের অমানুষিক কাহিনী বাঙলার সংবাদপত্র-গুলিতে প্রায় প্রত্যহ প্রকাশিত হয়। অবশ্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের হৃদয়হীন সংকীর্ণতা এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের নির্জীব উদারতা মুসলমানদের শুধু মুসলমান কেন, পরবর্ত্তীকালে খৃষ্টানদের উল্লিখিতরূপ মনোভাব ও প্রেরণাকে অবিশ্বাস্তরূপে ইন্ধন যোগাইয়াছিল ইহা অস্বীকার শুধু সত্যের অপলাপ নহে—বিরাট আত্মপ্রতারণা। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, মুসলমান শুধু ভারতে নহে বিশ্বের অন্যান্য বহু অংশে বিস্তার লাভ করিয়াছে। ভারতে মুসলমান ধর্ম্মের বিস্তার

এবং ভারতীয় মুসলমানদের মনোভাব অন্যান্য মুসলমান অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি পাকিস্থানের মনোভাব ও নীতি কিরূপ হইবে তাহা আমি বহু প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। ঐরূপ মনোভাব সতেজ থাকিলেও পাকিস্থান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ ও উহার অংশ বিশেষ গ্রাস করা সম্ভব কি? দ্বিধাহীনভাবে এক কথায় বলা চলে—একক পাকিস্থানের পক্ষে ভারত আক্রমণ অসম্ভব। ইহা একান্তভাবে আত্মঘাতী হইতে বাধ্য। প্রথমত দেখা যায় পাকিস্থান পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুইটি ভাগে বিভক্ত। স্থলপথে এই দুইটি অংশের মধ্যে কোন যোগাযোগ নাই। একমাত্র সমুদ্রপথে আরব সাগর, ভারত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী পূর্ব্ব পাকিস্থানে উপনীত হওয়া সম্ভব। উল্লিখিত বিরাট জলভাগের প্রায় নয় দশমাংশ ভাগ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। শান্তিকালীন অবস্থায় এই সুদীর্ঘ সমুদ্রপথে যোগাযোগ রক্ষা করিবার ক্ষেত্রে সময় এবং ব্যয় বাহুল্যের বিষয় বাদ দিলেও বাণিজ্যপোত ও নৌ-বহর কিরূপ শক্তিশালী রাখা প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমেয়। এই অবস্থায় যুদ্ধ ঘোষিত হইলে পাকিস্থানের দুইটি অংশ কিরূপ শোচনীয়ভাবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে তাহা নিতান্ত শিশুর পক্ষেও হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টকর নহে।

তারপর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে কিরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইবে তাহাও বিচার করা প্রয়োজন। ভারত সীমান্তের ভৌগোলিক দিক আলোচনায় দেখা গিয়াছে পূর্ব্ব-পাকিস্থানের তিন দিক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। একমাত্র পূর্ব্ব-দক্ষিণ ভাগের সমুদ্রপথ উন্মুক্ত। এই সমুদ্রপথ ভারতীয় নৌ-বহর যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অবরুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে ইহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অভ্যন্তরভাগ উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক বাধাহীন সমভূমি। পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র এই দুইটি বৃহৎ নদী পূর্ব্ব-

পাকিস্থানকে মুখ্যত তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। গঙ্গা বাঙলায় প্রবেশ করিয়া পদ্মা নামে পরিচিত। ইহা প্রায় পূর্ব্ব-বাহিনী হইয়া পূর্ব্ব পাকিস্থানকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ আসাম সীমান্ত হইতে প্রায় সোজা পশ্চিম-বাহিনী হইয়া ব্রহ্মপুত্র যমুনা নামে পদ্মার সহিত মিশিয়া মেঘনা নাম ধারণ করিয়াছে। ইহাতে দেখা যায় পূর্ব্ব-পাকিস্থানের জেলাগুলি নিম্নোক্ত তিনটি ভাগে বিভক্ত। উত্তর-পশ্চিম কোণে মালদহ, দিনাজপুর, রঙপুর, পাবনা, বগুড়া জেলা লইয়া গঠিত উত্তরবঙ্গ ; দক্ষিণে পদ্মা ও পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মপুত্র (যমুনা) দ্বারা বেষ্টিত। পাবনা ও নদীয়ার মধ্যে পদ্মার উপর নির্ম্মিত বিখ্যাত 'সারা ব্রীজ' স্থলপথে উল্লিখিত অংশকে পূর্ব্ব পাকিস্থানের দক্ষিণ-পূর্ব্ব জেলাগুলির সহিত যুক্ত রাখিয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের অপর তীরে পূর্ব্ব-দক্ষিণ অংশে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলা অবস্থিত। পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থল হইতে এই অঞ্চল মেঘনা দ্বারা দক্ষিণ-পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন। অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব্ববঙ্গ পদ্মা ও মেঘনার কয়েকটী বড় বড় শাখা নদীর দ্বারা বিভক্ত। সুতরাং দেখা যায়, বিমান ও যান্ত্রিক বাহিনীর যুগে শুধু স্থলপথে বিভিন্ন দিক হইতে অগ্রসরমান ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে উপনীত হইতে সর্ব্বাধিক এক সপ্তাহ লাগিবে।

পশ্চিম পাকিস্থানের অবস্থা এই দিক হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহার উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্থান ও শক্তিশালী সোভিয়েট রুশিয়া অবস্থিত। পশ্চিম দিকে মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলি রহিয়াছে। জলপথ হিসাবে আরব সাগর এবং পারস্য ও লোহিত সাগর হইয়া সুয়েজ খাল দিয়া ভূমধ্য সাগর গমন পথ উন্মুক্ত। ভারতীয় নৌবহর আরব সাগর আংশিকভাবে অবরোধ করিতে সমর্থ হইলেও আরব সাগরের আফ্রিকার উপকূলবর্ত্তী দরিয়ায় হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইবে না। অবশ্য পূর্ব্ব আফ্রিকা, বৃটিশ

সোমালিল্যাণ্ড ইত্যাদি অঞ্চল পাকিস্থানের বিরোধী ও ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্রের পক্ষভুক্ত থাকিলে পাকিস্থানের সমুদ্রপথ সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। আভ্যন্তরীণ আবস্থা বিচার করিলে দেখা যায়, বিশাল ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নদী সিন্ধুর বৃহৎ অংশ পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ইহার ফলে পশ্চিম পাকিস্থানের শিল্প, কৃষি ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সর্ব্বতোভাবে সিন্ধু নদের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু সিন্ধু ও ইহার প্রধান শাখানদী শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী ও তাপ্তীর উৎপত্তিস্থল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র। পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের কৃষি যে ঐ সকল নদনদীর উপর নির্ম্মিত বাঁধ ও খালের সেচ পরিকল্পনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই অবস্থায় সিন্ধু ও পাঞ্জাবের পঞ্চনদীর জলধারার গতিপথ পরিবর্ত্তন অথবা অন্য কোন ভাবে ব্যাহত করা হইলে পশ্চিম পাকিস্থানের কৃষি ও শিল্প-জীবনে যে বিপর্যয় সৃষ্টির আশঙ্কা আছে তাহা কল্পনা করিতেও দেহ মন শিহরিয়া উঠে। পাকিস্থানের রাষ্ট্রনায়ক-গণ উল্লিখিত জটিল সমস্যা এবং অসহায় অবস্থা সম্পর্কে অতিশয় সচেতন। তাঁহাদের তরফ হইতে জম্মু ও কাশ্মীর দাবী উত্থাপিত হইবার ইহাই সর্ব্ব-প্রধান কারণ। হিমালয়ের তুষার গলা জলধারার মধ্যে পাকিস্থানী নর-নারীর জীবনীশক্তি সর্ব্বতোভাবে নির্ভরশীল বলিয়া কাশ্মীর সমস্যা তাঁহাদের জীবন মরণ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এই কারণে তাঁহারা কাশ্মীর রণাঙ্গণে সর্ব্বস্ব পণ করিতেছেন।

তারপর দেখা যায়, পশ্চিম পাকিস্থানের উত্তর ও পশ্চিম অংশ সুউচ্চ পর্ব্বতাকীর্ণ এবং দুর্দ্ধর্ষ উপজাতি অধ্যুষিত। ভারত-পাকিস্থান সংগ্রামে আফগানিস্থান নিরপেক্ষ থাকিলে পশ্চিম পাকিস্থানের অন্যান্য সমস্ত দিক অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলেও পশ্চিম দিকের পথগুলি উন্মুক্ত থাকিবে। ঐ সকল সরবরাহ পথ নিরাপদ রাখিয়া পাকিস্থান-বাহিনী উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল ঘাঁটি করিয়া সুদীর্ঘকাল সংগ্রাম চালাইতে সক্ষম হইবেন। বিমান ও

যান্ত্রিক বাহিনী তথায় সম্পূর্ণ অচল। সুরক্ষিত পার্ব্বত্য ঘাঁটীতে অবস্থিত একজন সৈনিক বিপক্ষের শত সৈনিকের সমতুল্য।

এক্ষণে প্রশ্ন এই যে উল্লিখিত অবস্থা সম্পর্কে সম্যক সচেতন থাকিয়া অর্থাৎ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যে এক বিরাট অংশ অর্থাৎ পূর্ব্ব-পাকিস্থান হারাইতে বাধ্য হইবার বিষয় জানিয়াও পাকিস্থান একক যুদ্ধ ঘোষণা করিবে কি? প্রারম্ভেই আমি উল্লেখ করিয়াছি একক পাকিস্থান স্বীয় স্বার্থ অথবা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশবিশেষ দখল করিবার উদ্দেশ্যে কখনও সেইরূপ আত্মঘাতী নীতি ও পথ অনুসরণ করিতে পারে না।

তবে নিম্নোক্ত দুইটী অবস্থায় পাকিস্থান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারে।

(১) মুসলমান রাষ্ট্র সংহতি

(২) বৈদেশিক স্বার্থের প্রভাব

(ক) ইউরোপীয় শক্তি

(খ) সোভিয়েট রুশিয়া

সোভিয়েট রুশিয়া

তারপর সোভিয়েট রুশিয়া। প্রথমেই প্রশ্ন উঠে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণের কোনরূপ সঙ্কল্প সোভিয়েট রুশিয়ার আছে কি? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হইলে আক্রমণ নীতির দুইটি দিক বিচার বিশ্লেষণের পর আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন।

(১) সশস্ত্র লাল ফৌজের অভিযান।

(২) সশস্ত্র লালফৌজের পোষণে বিশ্ব-বিপ্লব সৃষ্টিকারী কম্যুনিষ্ট দলের প্রচার ও অন্যান্য কার্য্যকলাপ—ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দলকে ধন, জন ও অস্ত্রশস্ত্র সাহায্য দিয়া আভ্যন্তরীণ বিপ্লব সৃষ্টির ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ।

প্রথম দফা অর্থাৎ সশস্ত্র লালফৌজের অভিযানের বিভিন্ন দিক আলোচনা আমার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় দফা বিষয়টি সামরিক দিক হইতে বিবেচ্য হইলেও সেই বিষয়ে মাথা ঘামাইবার দায়িত্ব মুখ্যত শাসন ও রাজনৈতিক বিভাগের উপর ন্যস্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি।

জার শাসিত রুশিয়ার অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় প্রসিদ্ধ রুশ জেনারেল স্কোবোলেও এক সময় মন্তব্য করেন, 'মধ্য এশিয়ায় রুশিয়ার শক্তি বৃদ্ধি ঘটিলে ভারতে বৃটিশ শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে এবং সেই কারণে বৃটিশ ইউরোপে অধিকতর আপোষ সুলভ মনোভাব ও নীতি গ্রহণে বাধ্য হইবে।' ইহা পাঠ করিয়া লর্ড কার্জ্জন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। রুশ সম্রাট প্রায়ই ইউরোপের লক্ষ্য বস্তুর সহিত ভারতকেও যুক্ত ভাবে দেখিতেন। ফ্রান্স বৃটিশের সহিত জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত দেখিয়া ফরাসী বিপ্লবী মীরাবু ১৭৮৫ সালে ফ্রান্সকে সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে রুশিয়াকে ভারত আক্রমণের অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

নেপোলিয়ান ভারত দখলের প্রথম ধাপ হিসাবে মিশর আক্রমণ করিয়াছিলেন। কর্সিকাসের নীল নদ অভিযান ব্যর্থ হইলে রুশিয়াকে ভারত আক্রমণের অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া তিনি প্রথম পলের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে নেপোলিয়ান ইহাও উল্লেখ করেন যে, তিনি লোকবল ও অন্যান্য সাহায্য প্রদান করিতে প্রস্তুত। পল এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। তিনি ডন উপত্যকার দুর্দ্ধর্ষ সেনাপতি জেনারেল অরলভকে ২২,৫০০ অশ্বারোহী কসাক সৈন্য লইয়া ভারত আক্রমণ চালাইবার নির্দ্দেশ প্রদান করেন। জেনারেল অরলভের নিকট পল নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক খানি পত্র প্রেরণ করেন "অভিযানের পুরস্কার স্বরূপ ভারতের সম্পদ আপনি পাইবেন। ভারত

জয়ে রুশিয়ার সম্পদ ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর (বৃটিশ) মর্ম্মস্থলেও আঘাত হানা হইবে।'

পলের পর প্রথম আলেকজাণ্ডার সিংহাসন প্রাপ্ত হইলে পরিকল্পনাটি সমগ্র ভাবে পরিত্যক্ত হয়। পরে নেপোলিয়ান পূর্ব্ব রুশিয়ার টিলামঠে প্রথম আলেকজাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহারা একযোগে ভারত আক্রমণের একটা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। ১৮০৮ সালের ২রা জানুয়ারী আলেকজাণ্ডারের নিকট লিখিত একখানি পত্র রুশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। উক্ত পত্রে ফরাসী নেতা ৫০ হাজার সৈন্য লইয়া রুশ-ফরাসী একটি যুক্ত বাহিনী গঠনের প্রস্তাব করেন। এই প্রসঙ্গেই নেপোলিয়ান ভবিষ্যদ্বাণী করেন—'ইহাতে ইংলণ্ড পদানত হইবে।'

রুশ সরকারী দলিলপত্র দৃষ্টে বুঝা যায়, ক্রমশঃ ভারত সীমান্তের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রয়োজন মত চিরশত্রু বৃটিশের উপর যাহাতে চরম আঘাত হানা চলে তদুদ্দেশ্যে দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার একটি গোপন পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অন্যান্য দলিল পত্র হইতে বুঝা যায় জার শাসিত রুশিয়া ভারত জয়ের জন্য বহু পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিল—কিন্তু কদাপি উহা কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। ঐতিহাসিক দলিলপত্র বিচার করিলে ইহাও বুঝা যায় যে, ভারতের একটা বিরাট অংশ জয় ও দখলের পর উহা শাসন করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া রুশবাসী বিশ্বাস করিতেন না।

আসলে দেখা যায়, ভারত আক্রমণের হুমকি প্রদর্শন করিয়া জার বৃটিশ হইতে কতক সুযোগ সুবিধা আদায় করিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন। বাস্তবপক্ষে উল্লিখিত ধরণের ঘটনা ঘটিয়াছিল। ১৯০৭ সালে পারস্যের প্রভাবিত এলাকা বিভাগ সম্পর্কে ইঙ্গ-রুশ যে চুক্তি সম্পাদিত হয় উহাতে বৃটিশকে আফগানিস্থানে অধিকতর সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভারত সম্পর্কে

রুশিয়ার কোন লোভ নাই। উক্ত চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে প্রথম বিশ্ব মহাসমরে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে ইঙ্গ-রুশ সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তুরস্কের দার্দ্দানেলিস প্রণালী ও কনষ্টাণ্টিনোপলস সম্পর্কে বৃটিশ রুশিয়ার দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

অবশ্য বর্ত্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বৃটিশ ভারত ত্যাগ করিয়াছে। এই সুযোগে রুশিয়া ভারতকে একটী উপনিবেশে পরিণত করিবার বহু পুরাতন আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের জন্য সচেষ্ট হইবে বলিয়া বিভিন্ন মহল হইতে অভিমত প্রকাশ করা হইতেছে।

অনেকে মনে করেন, কয়েক লক্ষ লালফৌজ, হাজার হাজার ট্যাঙ্ক, মর্টার, হাউজার, কামান, কামানবাহী ট্রাক সহ ইউরোপীয় রুশিয়া হইতে উরাল পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া জনবিরল খিরগিজ প্রান্তরের ভিতর দিয়া তুর্কীস্থান, আফগানীস্থান পার হইয়া চির তুষারাবৃত হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রমের পর সূর্য্য কিরণোজ্জ্বল ভারত ভূমিতে উপনীত হইবেন। বহু সংখ্যক লালফৌজের পক্ষে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বিভিন্ন স্থলপথে ভারতে প্রবেশ করা হয়ত সম্ভব হইবে। তাঁহারা পরবর্ত্তী সৈন্যদল অগ্রসর হইবার পথও প্রশস্ত করিয়া তুলিতে পারিবেন। ঐরূপ আশঙ্কা পোষণকারীর দল আরও মনে করেন যে, সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষ পোল্যাণ্ড, রুমানিয়ার ন্যায় ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের সহযোগিতায় ভারতের শাসনকার্য্য চালাইতে সমর্থ হইবেন।

সোভিয়েট রুশিয়ার রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা সর্ব্বজনবিদিত। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংস সাধনের জন্য বিশ্ব-বিপ্লব সৃষ্টি কম্যুনিজম এবং ইহার ধারক ও বাহক রুশ রাষ্ট্রনায়কগণের প্রধান লক্ষ্য বস্তু। বিশ্ব-বিপ্লব সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁহাদের পক্ষে কিরূপ নীতি অনুসরণ শ্রেয় ইহা লইয়া রুশিয়ায় যে দলাদলি সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ষ্ট্যালিন—ট্রটস্কি বিরোধ বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই বিরোধের কারণ সম্পর্কে দুইটি

মত বিগুমান। এক দল বলেন, লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁহার তুই প্রিয় অনুচরের মধ্যে ব্যক্তিগত ঈর্ষ্যার ফলেই এই বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছিল, রাজনৈতিক মতানৈক্য গৌণ। অপর দল বলেন তাহা নহে—রাজনৈতিক মতানৈক্য মূল কারণ। বিশেষ করিয়া বিশ্ব-বিপ্লব সৃষ্টির নীতি নির্দ্ধারণ ক্ষেত্রেই বিরোধ সুতীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই ঈর্ষ্যা ও রাজনৈতিক মতবিরোধ উভয়ের সংমিশ্রণে লেনিনের দক্ষিণ ও বামহস্তের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সংঘর্ষের পরিণতি সোভিয়েট রুশিয়া ও বিশ্বের সর্ব্ব-হারাদের মঙ্গলকর অথবা অহিতকর হইয়াছে এই বিষয়েও আমরা কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অক্ষম। কারণ একটি নীতি অনুসৃত হইয়াছে অপরটি অঙ্কুরেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এইটুকু আমরা দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতে পারি যে, লেনিনের তুই সবল বাহুর মল্লযুদ্ধে একটি বাহু ভগ্ন হওয়াতে দেহাবয়ব বিকলাঙ্গ হইয়াছে। সে যাহা হউক রাষ্ট্রবিহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ব-বিপ্লব সৃষ্টি সম্পর্কে ট্রটস্কির মতবাদ স্থূলভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, সাধারণভাবে কম্যুনিষ্ট মতবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে শক্তিশালী লালফৌজকে সুযোগ ও সুবিধা অনুযায়ী রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিয়া লইতে হইবে। ট্রটস্কির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা অত্যন্ত সুদৃঢ় ইস্পাত কাঠামোর উপর রচিত। ইহার কোন অংশে মরিচা ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে রুশ নরনারীকে অস্ত্রবল প্রয়োগের দ্বারা উহাকে চূর্ণ করিতে হইবে। রুশিয়ায় জারতন্ত্রের পতন ও কম্যুনিষ্ট দলের অভ্যুত্থানের ইতিহাস বিচার করিলে দেখা যায়, প্রথম বিশ্ব মহাসমরে জার মিত্রপক্ষভুক্ত থাকিয়া জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। ইহাতে জার্ম্মাণ বাহিনীকে তুইটি রণাঙ্গণে সংগ্রাম চালাইতে হইয়াছিল। জার বাহিনীর সহিত সংগ্রাম সুতীব্র না হইলেও হিণ্ডেনবার্গকে প্রায়

৬ ডিভিসন সৈন্য রুশ রণাঙ্গণে মোতায়েন রাখিতে হইয়াছিল। অনেকে বলেন, উক্ত ৬ ডিভিসন সৈন্য ভার্দ্দুন রণাঙ্গণে প্রেরণ সম্ভব হইলে প্রথম বিশ্ব মহাসমরের ইতিহাস হয়ত ভিন্ন ভাবে লিখিত হইত। তাঁহারা ইহাও বিশেষ জোড়ের সহিত উল্লেখ করেন যে, জার্ম্মানীর পরাজয়ের ইহা অন্যতম মুখ্য কারণ। জার্ম্মাণ রাষ্ট্রনায়ক ও সমরনায়কগণ এই সঙ্কটের রূপ বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা লেনিনের সাহায্যে রুশিয়ায় অন্তঃবিপব সৃষ্টির পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাইজারের অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া লেনিন তাঁহার ক্ষুদ্র বলসেভিক দলের সাহায্যে জারতন্ত্রের অবসান ঘটাইয়া পরে অক্টোবর বিপ্লবকে জয়যুক্ত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কম্যুনিষ্টদের পক্ষে ইহা একটি বিরাট শিক্ষা। অস্ত্রবল প্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর সমাজবিপ্লব সৃষ্টি যুক্তিযুক্ত ও সহজসাধ্য। রুশিয়ায় তাঁহারা সেই পথই অনুসরণ করিতেছেন। রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করিয়া তাঁহারা রুশ জনসাধারণকে মার্ক্সীয় অর্থনীতি ও দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিতেছেন। সুতরাং লালফৌজকে সঙ্গীন উঁচাইয়া ধরিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের জনসাধারণকে বলিতে হইবে বাইবেল, কোরাণ, বেদ, ত্রিপিটক ত্যাগ করিয়া ক্যাপিটেল পাঠ কর— অন্যথায় মর। ইহাই ট্রটস্কি মতবাদের মূল কথা।

ষ্ট্যালিন উহার বিরোধিতা করিয়া বলিলেন ১৮ কোটী নরনারীর পক্ষে অস্ত্রভীতি প্রদর্শন করিয়া পুঁজিবাদী বিশ্বকে জয় করা সম্ভব নহে। কারণ জনবল ও অস্ত্রবলের দিক হইতে পুঁজিবাদী দল বহুগুণ শ্রেষ্ঠ। রাজ্য জয় দ্বারা কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার পথ গ্রহণ করিলে শুধু যে রুশিয়া ধ্বংস হইবে তাহা নহে সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিজমও চিরতরে সমাহিত হইবে। সর্ব্ব-প্রথম রুশিয়াকে সকল দিক হইতে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে হইবে। সম্পদ ও শক্তিশালী সোভিয়েট রুশিয়া বিশ্ব পুঁজিবাদের বুকের পাঁজরের উপর অহোরাত্র শাঁখের করাত চালাইবে। সুতরাং পুঁজিবাদী

বিশ্ব-সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সোভিয়েটের অস্তিত্ব বিশ্ব-বিপ্লবকে বেগবতী ও অপ্রতিহত করিয়া তুলিতে বাধ্য।

তারপর পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা সহস্র সমস্যা ও অন্তর্দ্বন্দ্বসঙ্কুল। এই সমস্যা ও অন্তর্দ্বন্দ্বগুলি মানুষের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবনে অহরহ বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। ইহার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ অর্থাৎ বিরোধ ও সংঘর্ষের গ্লানি ভারাক্রান্ত জনগণকে সেই সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা কম্যুনিষ্ট প্রচারক-দের প্রধান কাজ হইবে। ইহার জন্য তাঁহাদের সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অতি সুনিপুণভাবে প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে। কোন ক্ষেত্রে বিরোধ সৃষ্টি হইলে উহাকে তীব্রতর করিয়া দীর্ঘ সংঘর্ষে পরিণত করিবার জন্য বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে।

এই কারণে আমরা দেখিতে পাই সমরসজ্জার বিষয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়কগণ যেমন বিশেষ সচেতন তদ্রূপ সোভিয়েট প্রচার কার্য্য অত্যন্ত সুগঠিত ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়ক-গণের উল্লিখিত নীতিতে আস্থাবান বলিয়া আমরা চীনে, স্পেনে, গ্রীসে, ইতালীতে ও বল্কান রাষ্ট্রে তাঁহাদের কর্ম্মরূপ আমাদের নিকট অনেকটা সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। পুঁজিবাদী বিরোধের ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া যে কোন শ্রেণীর গৃহযুদ্ধে সবল হস্তে ইন্ধন প্রদানে তাঁহারা সিদ্ধহস্ত। সশস্ত্র লাল ফৌজ লইয়া আক্রমণ চালাইয়া রাজ্যবিশেষ দখল দ্বারা সোভিয়েট প্রতিষ্ঠা না করিয়া অন্তর্বিপ্লবের সুযোগে স্বীয় প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠাই সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়কগণের লক্ষ্য।

সুতরাং আমরা অনেকটা নিশ্চয়তার সহিত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারি যে লালফৌজ কখনও জনবিরল বিস্তীর্ণ খিরগিজ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া চিরতুষারাবৃত সুউচ্চ গিরি পথের ভিতর দিয়া ভারতের বুকে অভিযান চালাইবেন না। অবশ্য ভারতীয় কম্যুনিষ্টদল বিদ্রোহ সৃষ্টি করিলে

রুশরাষ্ট্র নায়কগণ যে ঐ সকল পথে প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র ও সমর সরঞ্জাম প্রেরণের জন্য প্রচুর ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকারে কিছুমাত্র ইতস্তত করিবেন না ইহা ধ্রুব সত্য। তারপর ইহাও আমাদের বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চীনে ও বল্কানে কম্যুনিষ্ট শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে ষ্ট্যালিন সেই নূতন পরিস্থিতির সুযোগে ট্রটস্কির নীতি অনুসরণ করিবেন না ইহা জোড়ের সহিত ভবিষ্যৎবাণী করা মোটেই সম্ভব নহে।

এশিয়া ও ইউরোপ ভূখণ্ডে সোভিয়েট নেতৃত্বাধীনে কম্যুনিষ্টদের যে বিরাট সাঁড়াশী অভিযান ধীরে অথচ বিশেষ দৃঢ় ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রান্তে চীনের গৃহযুদ্ধ এবং পশ্চিমপ্রান্তে বল্কান রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তরীণ গোলযোগের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু বিশ্ববিপ্লব সৃষ্টির অভিযান দুই প্রান্ত সীমা ধরিয়া অগ্রসর হইয়া লক্ষ্য স্থলে উপনীত হইতে সমর্থ হইবে না। মধ্য প্রাচ্যের বিরাট মরু অঞ্চলে উল্লিখিত অভিযানের চূড়ান্ত সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হইবে। মধ্য প্রাচ্যের উষর মরুবুকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দ্বারাই পুঁজিবাদের ভবিষ্যৎ চূড়ান্তভাবে নির্দ্ধারিত হইবে। এই কারণে মধ্য প্রাচ্য সম্পর্কে সোভিয়েট নীতি আমাদের বিশেষভাবে অনুধাবন প্রয়োজন। সোভিয়েট সম্প্রসারণ নীতির বিষয় বাদ দিলেও আমাদের সীমান্তবর্ত্তী প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে মধ্য প্রাচ্যের রাষ্ট্রখণ্ডগুলির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার বিষয় আমাদের গভীর ভাবে অনুধাবন অপরিহার্য্য।

মধ্য প্রাচ্য

মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের বর্ত্তমান অবস্থা পৃথক ভাবে আলোচনা প্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে সিরিয়া, লেবানন, ট্রান্সজর্ডান, মিশর, ইরাক সৌদিআরব ও আরবরাষ্ট্রখণ্ডগুলি আরব লীগের অন্তর্ভুক্ত। তুরস্ক

ও পারস্য মুসলিম রাষ্ট্র হইলেও মুসলিম রাষ্ট্র সংহতির জিগীরদার আরব লীগ ঐ দুইটি রাষ্ট্রকে সদস্যভুক্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলি মুসলিম শাসিত হইলেও আরব লীগের অধীনে মিশর, সিরিয়া ও লেবানন, ট্রান্সজর্ডান, আরব, সৌদি আরব ও ইরাক ইসলাম বিপন্নের ধুয়া তুলিয়া মুসলিম রাষ্ট্র সংহতির দাবী মূলক কর্ম্মপন্থা ও নীতি অনুসরণ করিতেছে। এই দাবী যুক্তিযুক্ত কিনা তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই, আমি পূর্ব্বে বহু ক্ষেত্রে উল্লেখ করিয়াছি যে মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন যাযাবর দস্যুদল ভারতের বুকে বহুবার লুণ্ঠন ও হত্যার তাণ্ডব সৃষ্টি করিয়াছিল। সুদূর অতীতে ইহা সম্ভব হইলেও বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে মধ্য প্রাচ্যের কোন রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে ভারত সীমান্ত লঙ্ঘনের চিন্তা মাত্র পোষণ যে বাতুলতা তাহাও আমি উল্লেখ করিয়াছি; ইহার কারণ বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। তবে মুসলিম রাষ্ট্রসংহতির দাবীদার আরব লীগ মধ্য প্রাচ্যের অপর দুইটি মুসলিম রাষ্ট্র তুরস্ক ও পারস্যকে দলে টানিয়া পাকিস্থানীকে সহযোগী করিতে সমর্থ হইলে ইসলামিক সাম্রাজ্য বিস্তার-নীতি ও অভিযান সম্পর্কে ভারতকে সচেতন হইতে হইবে। সুতরাং আরব ঐক্য ও মুসলমান রাষ্ট্রসংহতি কিভাবে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে তাহা আমাদের গভীরভাবে অনুধাবন প্রয়োজন।

মধ্য প্রাচ্য সমস্যা অত্যন্ত ব্যাপক ও জটিল। ইহার কারণ ত্রিবিধ। প্রথম ভৌগোলিক অবস্থা, দ্বিতীয় তৈল সম্পদ, তৃতীয় মধ্য প্রাচ্যের সিংহদ্বার স্বরূপ প্যালেষ্টাইনের জেরুজালেম নগরী মানব সভ্যতার তিনটি প্রধান গতি ধারার উৎসস্থল। স্থলপথে প্রাচ্য ও প্রতীচীর ইহাই সংযোগ স্থল বলিয়া ইহার অবস্থানিক গুরুত্ব অত্যধিক। যান্ত্রিক সভ্যতা তৈল ব্যতীত সম্পূর্ণ অচল, কাজেই মধ্য প্রাচ্যের তৈল খনি সমূহের গুরুত্ব বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। সর্ব্বশেষ যে কয়টি বিভিন্ন ধর্ম্মমতকে অবলম্বন করিয়া মানব সভ্যতা টিকিয়া রহিয়াছে তন্মধ্যে মুসলমান, খৃষ্টান ও ইহুদী

সম্প্রদায়ের পবিত্র তীর্থভূমি জেরুজালেমে অবস্থিত। কাজেই আমরা দেখিতে পাই বিশ্ব রাষ্ট্র গোষ্ঠির চলাচল ; অর্থ নৈতিক এবং ধর্ম্মীয় অর্থাৎ সামাজিক স্বার্থ মধ্য প্রাচ্যের সহিত গভীর ভাবে জড়িত। বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাত মধ্য প্রাচ্যের মরুময় অম্বুধির বুকে কিরূপ কুটিল চক্রজাল বিস্তার করিতেছে তাহা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলে নিম্নোক্ত অবস্থা পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

(১) বিভিন্ন পুঁজিবাদী স্বার্থ তথায় কদর্য্যভাবে মুখোমুখী দণ্ডায়মান। ইহা নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত করা চলে :—

(ক) খৃষ্টান (খ) ইহুদী (গ) মুসলমান।

খৃষ্টান পুঁজি আবার দুইভাগে বিভক্ত। ইউরোপীয়—মুখ্যত বৃটিশ ও ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্র এবং মার্কিন।

তদ্রূপ মুসলমান পুঁজিকেও দুইভাগে বিভক্ত করা চলে। (ক) আরব (খ) তুর্কী।

(২) সোভিয়েট রুশিয়া।

ইউরোপের পুঁজিবাদী স্বার্থের সংঘাত ও বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের বিরুদ্ধ স্রোতে হাবুডুবু খাইয়া মধ্যযুগীয় আচার রীতিনীতি, কুসংস্কার ও সামন্ততন্ত্রে বিশ্বাসী মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান রাষ্ট্রসমূহ—বিশেষ করিয়া আরব দেশগুলি আরব লীগের অধীনে সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ হইয়া জগতসভায় ইসলামের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অধীর। খৃষ্টান পুঁজিবাদী স্বার্থের পক্ষে আরব রাষ্ট্রসংহতি বরদাস্ত করা কোনক্রমেই সম্ভব নহে। ইসলামের বহুবিবাহ নীতি ও মুসলিম মহিলার গর্ভধারণ ক্ষমতা বিশ্ব জনসংখ্যার হার অতি দ্রুত বৃদ্ধি করিতেছে দেখিয়া কিছুকাল যাবৎ খৃষ্টান জগত আতঙ্কগ্রস্ত। খৃষ্টান জগত তথাকথিত গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক। কাজেই দূরদর্শী খৃষ্টান রাজনীতিবিদ্‌গণ মনে করেন, এইভাবে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অদূর ভবিষ্যতে শুধু ভোটের জোরে তাঁহারা

ইসলামের আসন সুদৃঢ় করিয়া তুলিবেন। তারপর আরও দেখা যায় খৃষ্টীয় উত্তরাধিকার আইন পুঁজি কেন্দ্রীভূত করার সমর্থক। তাই বর্ত্তমানে বিশ্বে খৃষ্টান পুঁজি অপ্রতিহত অপরাজেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অপর পক্ষে ইসলাম উত্তরাধিকার আইন পুঁজি বিকেন্দ্রীভূত করিবার পোষক। এই কারণে দেখা যায়, মুসলমান বাদশা ও সম্রাটগণ বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেও উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। কিন্তু মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির উহা পরিপোষক।

তারপর দেখা যায় যান্ত্রিক যুগ খনিজ তৈল ব্যতীত প্রায় অচল। ইউরোপ বিশেষ করিয়া বৃটিশ সর্ব্বাংশে এবং ফ্রান্স ও অন্যান্য রাষ্ট্র বহুলাংশে মধ্যপ্রাচ্যের তৈল সম্পদের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং তৈল ব্যবসায় খাতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ বাদ দিলেও প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের তৈল ব্যতীত বৃটিশ নরনারীর জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন। ইহা বৃটিশ নরনারীর জীবন মরণ সমস্যা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিশ্বের তৈল-সম্রাট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু কোটি ডলার মুদ্রা মধ্য প্রাচ্যের তৈলখনিতে বিনিযুক্ত।

ইহুদী সমস্যা

অতি প্রাচীন হিব্রু সভ্যতার ধারক ও বাহক জেহোবার সন্তান সন্ততি ইহুদীরা সুদূর অতীতে কয়েকবার প্যালেষ্টাইনের শাসন কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া শক্তি ও সম্পদশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে বিশেষ করিয়া অর্থ-গৃধ্নুতা ও যাযাবর জীবন যাপনের নেশার ফলে তাঁহারা বিশ্বের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেকে হয়ত বলিবেন উল্লিখিত অভিযোগ সত্য নহে। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মবিশ্বাস নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার—মানুষ হিসাবে মনুষ্য সমাজে বাঁচিয়া থাকাই বড় কথা। তাই তাঁহারা মানুষ হিসাবে বিশ্বের যে কোন নিভৃত কোনে বাঁচিয়া থাকিবার ও বাড়িয়া উঠিবার মহান আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রগুলি বিচার করিলে দেখা যায়, ইহুদীদের দান প্রচুর ও উল্লেখযোগ্য। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ইহুদী নরনারী এইভাবে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে বৃদ্ধি পাইতে থাকেন। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পুঁজিবাদী সভ্যতার কুৎসিত সংঘাত ১৯১৪-১৮ সালের মহাসমররূপে আত্মপ্রকাশ করিল। অনেকে মনে করেন এবং পরবর্ত্তীকালীন ঘটনাবলীতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, সেই নরমেদ যজ্ঞে আন্তর্জ্জাতিকতাবাদী অথচ অর্থসর্ব্বস্ব ও যাযাবর ইহুদী নরনারীর চক্রান্তে জার্ম্মান সম্রাট কাইজার ঘরে বাইরে প্রতিপদে বাধা ও ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হইয়া শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় বরণে বাধ্য হন। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্ম্মান পরাজয়ের ইহাই অন্যতম মুখ্য কারণ। ইহাতে ইহুদী সমাজের মনোভাব অনেকখানি নগ্ন হইয়া পড়ে। ইহারই পুরস্কার স্বরূপ তদানীন্তন বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ ব্যালফোর প্যালেষ্টাইন সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ নীতি বিশ্লেষণ করিয়া লর্ড রথচাইল্ড-এর নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করেন। গাজা বন্দর অধিকৃত হইবার পরবর্তী দিবস ১৯১৭ সালের ২রা নভেম্বর উক্ত পত্র প্রকাশিত হয়। উহা ব্যালফোর ঘোষণা নামে খ্যাত। উক্ত ঘোষণায় বলা হয়—"প্যালেষ্টা-ইনকে ইহুদীদের বাসভূমিতে পরিগণিত করার প্রস্তাব বৃটিশ সরকার সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। এই কার্য্যকে দ্রুততর করিবার জন্য বৃটিশ সরকার বিশেষ সচেষ্ট থাকিবেন। ইহাও এই সঙ্গে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে, বর্ত্তমানে ইহুদী ব্যতীত তথায় অপর যে সকল সম্প্রদায়ের নরনারী বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের নাগরিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত অধিকার অথবা ইহুদীরা অন্যান্য রাষ্ট্রে যে সকল অধিকার ও রাজনৈতিক মর্য্যাদা ভোগ করিতেছেন, তাহা কোন ক্রমেই ক্ষুণ্ণ করা হইবে না।"

জাতিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক উক্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হওয়াতে ইহুদী সমাজের রূপ আরও খানিকটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের প্রধান

রাষ্ট্রগুলি বিশেষ করিয়া বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক মধ্যপ্রাচ্য তথা এশিয়া সম্পর্কে ভবিষ্যতে কিরূপ নীতি অনুসৃত হইবে তাহা সুনির্দ্দিষ্ট গতিপথ অবলম্বনে অগ্রসর হইতে লাগিল। এদিকে ভার্সাই সন্ধির অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে বৃটিশ সাহায্যপুষ্ট হিটলার জার্ম্মানীর শাসনক্ষমতা হস্তগত করিলে তথায় ইহুদী বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিল। শেষ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাসমরে জার্ম্মাণ বাহিনীর পক্ষে ইহুদী নিধন সামরিক অভিযানের অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

হিটলারী অভিনয়ের যবনিকাপাত ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জ্জাতিকতার বুলি অত্যন্ত চড়া সুরে ধ্বনিত হইয়া বিশ্বের আকাশ বাতাস ভরিয়া তুলিল। ব্যক্তি, জাতি, রাষ্ট্র সকলের মুখে আন্তর্জ্জাতিকতা ভিন্ন বাক্য উচ্চারণ নাই। কিন্তু যাযাবর বিশ্ব-ইহুদীসমাজ মর্ম্মে মর্ম্মে গভীর ভাবে উপলব্ধি করিতে বাধ্য হইল যে মাতৃ বা পিতৃভূমি বলিয়া একটী ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গণ্ডী ও উহাকে অবলম্বন করিয়া জাতীয়তাবাদী নীতি অনুসরণ অবশ্য প্রয়োজন। কাজেই আমরা দেখিতে পাই যে ইহুদীদের মাতৃভূমি বলিয়া একটী বিশেষ স্থান নির্দ্ধারণ, দখল ও উহাকে স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত করা—প্যালেষ্টাইন সমস্যা তথা মধ্য প্রাচ্য সমস্যার সর্ব্বাধিক জটিল বিষয়।

ইহা গেল ইহুদীদের শিক্ষা। ইহুদীদের শোচনীয় অবস্থা ও দুর্গতি বৃটিশ, ফরাসী, মার্কিন ইত্যাদি খৃষ্টান পুঁজিবাদীর মনে কি কোনরূপ রেখাপাত করে নাই? অবশ্যই করিয়াছে। অতীত অভিজ্ঞতা ব্যতীতও প্রথম বিশ্ব মহাসমরের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে, যুদ্ধ চলিবার সময় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় মহাসমরের অন্তবর্ত্তী কালে ইহুদীদের ভূমিকা তাঁহারা বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহারা গভীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, শান্তিকালীন অবস্থায় নির্বিচারে অর্থোপার্জ্জন এবং যুদ্ধকালীন সময়ে গোপনে ব্যবসা পরিচালন, গুপ্তচরবৃত্তি গ্রহণ এবং

এক পক্ষকে ঘায়েল করা ইহুদীদের জাতীয় বৈশিষ্ট। এই নীতি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা ইউরোপের অর্থ নৈতিক জীবনে একটা বিরাট প্রভাব এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক জীবনকে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে গ্রাস করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। খৃষ্টান পুঁজিবাদ বুঝিতে পারিল যাযাবর অথচ শক্তিশালী ইহুদী পুঁজি বিশ্বের খৃষ্টান জগতে একটা গভীর দুষ্ট ক্ষত স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃপক্ষ হিটলারী নীতি ত্যাগ করিয়া ইহুদী রাহু কবলমুক্ত হইবার জন্য ব্যালফোর ঘোষণাকে অস্ত্ররূপে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। ইহার সুবিধা এই যে মুসলিম জনসংখ্যা ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃপক্ষকেই বেশী সশঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। এই অবস্থায় কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধারের পন্থা শ্রেয় গণ্য করিয়া তাঁহারা বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার প্রদান প্রতি-শ্রুতিকে কার্য্যকরী করিয়া প্রাচীনতম শত্রুকে নবতম শত্রুর বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়া উভয়ের ধ্বংসের পথ সুপ্রশস্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ওদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খৃষ্টানপুঁজি ইহুদী পুঁজিবাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিধ্বস্তপ্রায়। এই অবস্থায় ইহুদী পুঁজিবাদকে দুর্ব্বল অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে অন্যত্র স্থানান্তরের সুযোগ প্রদান সকল দিক হইতে সমীচীন। তাঁহারা দেখিলেন মধ্যপ্রাচ্যের তৈল সম্পদ সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় বস্তু। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐ তৈলের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। এদিকে মার্কিন তৈল ব্যবসায়ে ইহুদী পুঁজির প্রভাব অত্যধিক। সুতরাং মধ্যপ্রাচ্যের তৈল সম্পদে প্রবল ইহুদী পুঁজি বিনিয়োগের সুবিধা দিয়া প্যালেষ্টাইনে তাঁহাদের সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার যাবতীয় সুযোগ দান শ্রেয় ও যুক্তি-যুক্ত। এই কারণে ইসরাইল রাষ্ট্র গঠিত হইবার বিষয় ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উহাকে অনুমোদন করে। ইসরাইলকে মার্কিন ডলার সাহায্য প্রদানের বহু প্রস্তাব নানাভাবে উত্থাপিত ও গৃহীত হইয়াছে। এই

অভিযোগের কেহ বিরোধিতা করিলে আমি বলিব, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্রভাবে ইহুদী নিয়ন্ত্রিত।

এদিকে আরব লীগকে প্রতিহত করিবার জন্য বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ উদ্বিগ্ন। কাজেই পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষার দোহাই দিয়া তাহারা প্যালেষ্টাইনকে ইহুদী রাষ্ট্রে পরিণত করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মিত্রপক্ষের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কমনওয়েলথ অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ আফ্রিকা এবং নিউজিল্যাণ্ড ইসরাইল রাষ্ট্রকে অনুমোদন করিলেও বৃটিশ এখনও তাহা করে নাই। এই ক্ষেত্রে তাঁহারা আরব রাষ্ট্রগুলির সহিত সম্পাদিত অতীত সন্ধি ও চুক্তির বাধ্যবাধকতার প্রতি গভীর নিষ্ঠার ভাব প্রদর্শন দ্বারা আরব প্রীতিতে গদগদ হইয়া উঠিতেছেন। ইহার সরল অর্থ—মিত্রবেশে শত্রুতা। ইহাতে মার্কিন সাহায্য পুষ্ট ইহুদীদের বিরুদ্ধে দরিদ্র, অনগ্রসর ও ধর্ম্মান্ধ আরবদের সংগ্রামশক্তি ন্যূনতম সীমা ছাড়াইতে পারিবে না। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ আরও মনে করেন যে, ইহুদী পুঁজিবাদকে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে মধ্য প্রাচ্যে বিস্তার লাভের সুযোগ প্রদত্ত হইলে আরব রাষ্ট্রগোষ্ঠি দুর্ব্বল হইবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। মার্কিন খৃষ্টান পুঁজিবাদ এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিলেও তজ্জন্য মোটেই উদ্বিগ্ন নহে। বৃটিশ ও মার্কিন রাষ্ট্রনায়কগণ আরও মনে করেন যে, এইভাবে এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সোভিয়েট বিরোধী একটী শক্তিও গড়িয়া উঠিবে।

উল্লিখিত অবস্থা হইতে আমরা বৃটিশের চিরন্তনী দ্বৈত ভূমিকার কার্য্যরূপ এবং ইঙ্গ-মার্কিন খৃষ্টান পুঁজিবাদের অপূর্ব্ব ঐক্য ও সহযোগিতা দেখিতে পাই।

এই কারণে আমরা দেখিতে পাই যে, বৃটিশ ও মার্কিন খৃষ্টান পুঁজিবাদী স্বার্থের কূট ও ঘৃণ্য চক্রান্ত জালে জড়িত হইয়া যাযাবর ইহুদী ও অর্দ্ধ-

যাযাবর আরবগণ আজ জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। এই সংগ্রাম কখন কি ভাবে সমাপ্ত হইবে সেই সম্পর্কে কোনরূপ ভবিষ্যৎবাণী করা সম্ভব নহে। কারণ এই সংগ্রাম সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের শক্তি ও বুদ্ধিমত্তায় পরিচালিত নহে—ইঙ্গ-মার্কিন খৃষ্টান পুঁজিবাদী স্বার্থ "বিষস্য বিষমৌষধম্ নীতিই অনুসরণ করিতেছে।"

তারপর আরও দেখা যায়, এই শোচনীয় সংঘাত মধ্য প্রাচ্যের মরু বুকেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। আরব ও ইহুদী নরনারীর তাজা রক্ত ধূ ধূ বালু বুকে অতি দ্রুত শুষ্ক হইলেও অনুর্ব্বর মরু প্রান্তর উর্ব্বর হইয়া উঠিবার প্রভূত সম্ভাবনা আছে। ইহার ফলে সমগ্র এশিয়ার সুখ, শান্তি ও শ্রী বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা বিদ্যমান। ইহার গভীরতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে মধ্য প্রাচ্যের অপর দুইটী মুসলিম রাষ্ট্র তুরস্ক ও পারস্য এবং প্রতিবেশী সোভিয়েট রাশিয়ার মতিগতি ও নীতি অনুধাবন প্রয়োজন।

প্রথম বিশ্ব মহাসমরে তুর্কী সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইবার পর ১৯২৩ সালের ২৪শে জুলাই Lausanneতে মিত্রশক্তির সহিত সম্পাদিত চুক্তিতে তুরস্কের সীমা নূতন ভাবে নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়।

আরব লীগের অন্তর্ভুক্ত না হইলে তুরস্ক মুসলিম রাষ্ট্র এবং সম্পদ ও সমর শক্তির দিক হইতে ইহা মধ্যপ্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ শক্তি। ইসলাম বিপন্নের জিগীর তুলিয়া আরব লীগ ইহুদীদের বিরুদ্ধে যে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে ইহাতে তুরস্ক যোগদান করিতে পারে কিনা এই প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল। তুরস্কের ক্ষেত্রে প্রথমতঃ দেখা যায়, ইসলাম বিপন্নের ধ্বনিতে তুর্কী নরনারী বিচলিত নহে। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় মুসলিম রাষ্ট্র সংহতির স্বপ্ন তুর্কী নরনারীর মনে খানিকটা আলোড়ন ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করিলেও তাহারা সে আন্দোলনের সর্ব্বময় নেতৃত্ব করিতে ইচ্ছুক। আরব রাষ্ট্রগুলি

উহা স্বীকার করিয়া লইতে মোটেই প্রস্তুত নহে। স্বধর্ম্মী হইলেও তুর্কী এবং আরব রাষ্ট্র গোষ্ঠির নরনারীর সামাজিক আচার-রীতিনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিরাট পার্থক্য ও অনৈক্য বিদ্যমান। তদুপরি এক মিশর ব্যতীত আরবলীগের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রখণ্ডগুলি ৩১ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রথম বিশ্বমহাসমর পর্য্যন্ত তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরিবর্ত্তিত অবস্থায় তুর্কী প্রভুত্ব নূতন অবয়ব লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইবে এই আশঙ্কা সামন্ততন্ত্রী, অনগ্রসর, আরব রাজা, ইমাম ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে অতি মাত্রায় প্রবল। সুতরাং আরবলীগ ও তুরস্কের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। তবে ইহাও খানিকটা সত্য যে, ইঙ্গ-মার্কিন ষড়যন্ত্রে পরিচালিত সংঘর্ষ দীর্ঘ দিন পরিচালিত হইলে মধ্য প্রাচ্যের নেতৃত্ব পদ তুরস্কের লাভ করিবার সম্ভাবনাকে নির্ব্বিচারে বাতিল করা চলে না।

এই পর্য্যন্ত শ্বেতাঙ্গ পুঁজিবাদী স্বার্থের প্রতিভু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ এবং বিপন্ন ইসলাম ও ইহুদী সম্প্রদায়কে আমরা আসরে অবতীর্ণ দেখিয়াছি। ইহাদের মধ্যে ইসলাম ও ইহুদী স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া তাহারা রক্তাক্ত সংঘর্ষে লিপ্ত। ইঙ্গ-মার্কিন স্বার্থ ইন্ধন মাত্র যোগাইতেছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে বহুলাংশে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সোভিয়েট রুশিয়া এই পর্য্যন্ত যবনিকার অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে। সোভিয়েট সম্প্রসারণ অথবা বিশ্ববিপ্লব সৃষ্টির বিভিন্ন দিক আমি ইতিপূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। সেই প্রসঙ্গে আমি ইহাও দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করিয়াছি যে, সোভিয়েট বিশ্ববিপ্লব সৃষ্টির চূড়ান্ত সংগ্রাম মধ্যপ্রাচ্যের মরুবুকে অনুষ্ঠিত হইয়া মার্ক্সের স্বপ্ন সফল হইবে অথবা ভারতীয় চার্ব্বাক দর্শনের ন্যায় মার্ক্সবাদ কিম্বদন্তীতে পরিণত হইবে। সে যাহা হউক, বর্ত্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েট নীতিই আমাদের প্রধান বিচার্য্য বিষয়। উনবিংশ শতাব্দীর রুশ নীতি অনুধাবন করিলে দেখা যায়,

সর্ব্বঋতুতে নাব্য এইরূপ একটি বন্দর লাভ না করিলে রুশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানজনিত এক ঘরে অবস্থা দূর করা মোটেই সম্ভব নহে। এই কারণে অথবা বিশ্ববিপ্লবকে জয়যুক্ত করিবার জন্য লাল ফৌজকে সশস্ত্র অভিযান চালাইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচীর প্রধান সংযোগস্থল এবং বাণিজ্যপোত ও বিমান চলাচলের শ্রেষ্ঠ পথ মধ্য প্রাচ্যের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহার ফলে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা আংশিক ভাবে জয়যুক্ত এবং সর্ব্বঋতুতে নাব্য বন্দর লাভের আশু উদ্দেশ্য সফল হইবে। অনেকে মনে করেন মধ্যপ্রাচ্য পথে সোভিয়েট অভিযান নিম্নোক্তভাবে পরিচালিত হইবে।

(১) হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার অপর পার্শ্বে অবস্থিত রুশিয় তুর্কীস্থান হইতে লাল ফৌজ কাবুলের মধ্যবর্ত্তী বিভিন্ন গিরিপথ ধরিয়া অগ্রসর হইবে।

(২) এলব্রুজ ও হিন্দুকুশের মধ্যবর্ত্তী হিরাটের পথে অগ্রসর হইবে। এই পথের উত্তর ভাগে কারাকুরম মরু অঞ্চল অবস্থিত এবং ইহার অপর পার্শ্ব দিয়া রুশিয় রেলপথ গিয়াছে। ইহার পশ্চিম দিকে পারস্যের বিরাট Slat Desert অবস্থিত।

(৩) কাস্পিয়ান সাগর তীর হইতে তেহরাণ অথবা ইরাক এবং ইহার পর তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিস উপত্যকা ধরিয়া পারস্য উপসাগর।

(৪) ককেসাস রেলওয়ের জুল্‌ফা ষ্টেশন হইতে তাব্রিজ এবং তথা হইতে বিভিন্ন সড়ক ধরিয়া দক্ষিণ কুর্দ্দিস্থান, ইরাক ও পারস্য।

(৫) কৃষ্ণসাগর হইতে কনষ্টান্টিনোপল, ভসফরাস, দার্দ্দানেলিস হইয়া ভূমধ্যসাগর।

বন্দরের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায়, পারস্য উপসাগরীয় বন্দরগুলি সোভিয়েট রুশিয়ার সর্ব্বাধিক নিকটতম। লালফৌজ তৃতীয় ও চতুর্থ পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইরাক ও

ইরাণের সংযোগস্থলস্থিত প্রসিদ্ধ ইরাকি সহর বসরার সন্নিকটস্থ পারস্য উপসাগরীয় বন্দর আবাদান এবং পারস্য উপসাগর ও ওমান উপ-সাগরের সংযোগস্থলে অবস্থিত বন্দর আব্বাস তাঁহাদের দখলে আসিবে।

ইহার পরই পাকিস্থানের করাচি বন্দর গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্থান—আফগানিস্থানের সহযোগিতায় সোভিয়েট এই বন্দরের সুযোগ সুবিধা পাইতে পারে।

দার্দ্দানেলিস পথ সুবিধাজনক এবং ঐ পথে বাণিজ্যপোত চলাচল সম্পর্কে একটা চুক্তি আছে। কিন্তু দার্দ্দানেলিস পথের অসুবিধা এই যে, ইহার উভয় তীর নিরঙ্কুশ নহে। তদুপরি ঐ পথে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ সহজ হইলেও ইহার নির্গম পথগুলি—জিব্রাল্টার এবং সুয়েজ পাশ্চত্য শক্তি—বিশেষ করিয়া বৃটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন বলা চলে। সুতরাং দেখা যায়, বাল্টিক সাগর পথ যেরূপ সোভিয়েটের পক্ষে বিঘ্নসংকুল তদ্রূপ দার্দ্দা-নেলিস-ভূমধ্যসাগর পথও নিরাপদ নহে। এই কারণেই পারস্যের উপর সোভিয়েটের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে নিবদ্ধ। পারস্যের রাজনৈতিক জীবনে অশান্তি, গোলযোগ, মন্ত্রীসভার অনিশ্চয়তা এবং উপজাতি সর্দ্দারদের বিদ্রোহ—আজারবাইজান বিদ্রোহ ইত্যাদির মধ্যে সোভিয়েট প্রভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট।

ইহা গেল মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে সোভিয়েটের সাধারণ মনোভাব ও নীতি। ইহুদী-আরব সংঘর্ষের সুযোগে সোভিয়েট রুশিয়া তাহার চিরন্তন নীতিই অনুসরণ করিতেছে। সংঘর্ষকে দীর্ঘতর ও রক্তক্ষয়ী করিয়া সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য রুশ রাষ্ট্রনায়কগণ বিশেষ ভাবে সচেষ্ট। এই কারণে ইসরাইল রাষ্ট্র গঠিত হইবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইহার অব্যবহিত পরে রুশিয়া কর্ত্তৃক উক্ত রাষ্ট্র অনুমোদিত হয়। কোন পক্ষ প্রথম অনুমোদন দিয়াছিল ইহা লইয়া যথেষ্ট মতানৈক্য বিদ্যমান। আমরা যেহেতু ইঙ্গ-মার্কিন প্রচারযন্ত্রের অধীন

সেই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম অনুমোদক ইহা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হই। আমরা এইটুকু উপলব্ধি করিতে পারি যে, ইহুদী রাষ্ট্রকে অনুমোদন দান ক্ষেত্রে রুশ—মার্কিন একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। স্বতঃই প্রশ্ন উঠে এই তীব্র প্রতিযোগিতা কেন ?

(১) প্যালেষ্টাইনে আগত ইহুদীদের মধ্যে একটা অংশ প্রগতিবাদী অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী।

(২) ইহুদী ও শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান পুঁজির মধ্যে যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান, তাহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবনেই বিশেষ পরিস্ফুট। স্বতন্ত্র ইহুদী রাষ্ট্র গঠিত হইলে ইহা আরও বেগবতী হইয়া উঠিতে বাধ্য। ইহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহুলাংশে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।

(৩) আরব-ইহুদী সংঘর্ষ দীর্ঘস্থায়ী হইলে ইঙ্গ-মার্কিন সম্পর্ক তিক্ত হইবার আশঙ্কা আছে। (অবশ্য এইরূপ সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ।)

(৪) আরব-ইহুদী সংঘর্ষ চলিতে থাকিলে (ইহার সম্ভাবনা অত্যধিক) বৃটিশের দ্বৈত ভূমিকা ও নীতি নগ্ন হইয়া পড়িবে। তৎফলে আরব জগতে একটা বিরাট প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে এবং মধ্যপ্রাচ্যে পুঁজিবাদী বিরোধী একটা বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি সম্ভব হইবে। ইহাতে মধ্যযুগীয় শাসন, আচার, রীতি নীতি ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামন্ততন্ত্রের জীর্ণ কঙ্কাল ধ্বসিয়া পড়িয়া শুধু মধ্যপ্রাচ্যের নহে, বিশ্বপুঁজিবাদের ভিত্তিকে অবিশ্বাস্যরূপে দুর্ব্বল, এমন কি হয়ত নিঃশেষে ধুলিসাৎ করিবে।

ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃপক্ষের কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধারের নীতি অর্থাৎ ইসলাম ও ইহুদীদের সংঘর্ষে লিপ্ত রাখিয়া উভয় পক্ষকে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করিবার বিষয় আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা ব্যতীত বিশ্বপুঁজিবাদের পয়লা নম্বর শত্রু সোভিয়েটকে ধ্বংস এবং সম্ভব হইলে রুশিয়ায় জারতন্ত্র প্রবর্ত্তনের অথবা বহুধা বিভক্ত করিবার জন্য ইঙ্গ-

মার্কিন কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত সক্রিয়। সামরিক দিক হইতে রুশিয়াকে পরাভূত করিবার জন্য তাঁহারা নেপোলিয়ান ও হিটলারের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইতে বদ্ধপরিকর। বৃটিশ ও মার্কিন সমরনায়কগণ বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পশ্চিম অর্থাৎ ইউরোপীয় রণাঙ্গন এবং পূর্ব্ব অর্থাৎ চীন রণাঙ্গণ হইতে আক্রমণ চালাইয়া বিশ্বের সর্ব্বাধিক গণচেতনা সম্পন্ন বিরাট রুশদেশ জয় মোটেই সম্ভব নহে। নেপোলিয়ান, হিটলার ইহার জীবন্ত সাক্ষ্য। কাজেই পশ্চিম ও পূর্ব্ব রণাঙ্গণ হইতে সাধারণ আক্রমণ সুরু করিয়া মধ্যপ্রাচ্যের পথে মূল আঘাত দৃঢ়তার সহিত হানিতে হবে। প্রথম আক্রমণেই রুশিয়ার তৈল কেন্দ্র বাকু ও বাটুম দখল করিয়া পরে ধীরে ধীরে রুশিয়ার কেন্দ্রস্থলের দিকে অগ্রসর হইয়া দেশকে দ্বিধা বিভক্ত করা অত্যন্ত সহজ হইবে। তুরস্ককে অকাতরে ডলার এবং প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও বিমান সাহায্য প্রদান এবং পারস্যের সমরশক্তি বৃদ্ধি, অর্থ-নৈতিক ও রাজ-নৈতিক জীবনের উপর ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাব প্রতিপত্তি অস্বাভাবিকভাবে বজায় রাখিবার প্রচেষ্টার মধ্যে তাঁহাদের সোভিয়েট বিরোধী সমর পরিকল্পনার রূপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

পঞ্চম অধ্যায়

আক্রমণকারী ও আক্রমণ পথ

চীন

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ; উত্তর-পূর্ব্ব ও পূর্ব্ব দিকের পথগুলি দিয়া চীনা বাহিনী প্রবেশ করিতে পারেন। উত্তর সীমান্তের পশ্চিম ভাগে কাশ্মীর রাজ্য—আর একটু পূর্ব্ব দিকে তিব্বত হইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত যে পথগুলি গিরিদ্বারের ভিতর দিয়া ভারতে পৌছিয়াছে তাহার বিবরণ আমি পূর্ব্বে প্রদান করিয়াছি। একদল বলেন, এই সমস্ত পথে জ্ঞানপিপাসু পরিব্রাজকদের গমনাগমন চলিলেও সামরিক অভিযান পরিচালন মোটেই সম্ভব নহে। অপর দল বিশেষ জোড়ের সহিত বলেন, উহা ঠিক নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহারা বলেন, খুব সম্ভবতঃ ১৭৯২ সালে প্রায় ৭০ হাজার চীনা লইয়া গঠিত সৈন্যদল তিব্বতের কেন্দ্রস্থলে পৌছিয়া ছিলেন এবং নেপালে রণনিপুণ দুর্দ্ধষ গুর্খাসৈন্যদের চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সুতরাং তিব্বতের সহযোগিতায় অথবা তিব্বতীদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও চীনের পক্ষে উল্লিখিত পথগুলি দিয়া সৈন্যদল প্রেরণ সম্ভব স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য এই সমস্ত পথে অভিযানকারী চীনা সৈন্য-বাহিনীর পক্ষে ভারত জয় সম্পূর্ণ অসম্ভব। ভারতীয় বাহিনীকে বিভিন্ন রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করিয়া বিব্রত ও দুর্ব্বল এবং অভ্যন্তরীন শাসন ব্যবস্থায় ব্যাপক বিশৃঙ্খলা এমন কি অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া বিভিন্ন পথে আক্রমণকারী মূল ও শক্তিশালী অপর বাহিনীগুলিকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত পথে শত্রু সৈন্য দল প্রেরিত হইবে।

তারপর উত্তর সীমান্তের পূর্ব্ব প্রান্তে পূর্ব্ব-তিব্বতের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র ও উহার বিভিন্ন শাখা উপশাখার গতি পথের গভীর জঙ্গলাকীর্ণ ও হিংস্র পার্ব্বত্য উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল দিয়া শক্তিশালী চীনা বাহিনী প্রেরিত হওয়া এবং তাঁহাদের আসাম উপত্যকায় অবতরণের প্রভূত সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান।

ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত

আসাম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ। ইহার সীমান্ত ব্রহ্মের সহিত যুক্ত। আসাম-ব্রহ্ম সীমান্ত প্রায় ৬ শত মাইল দীর্ঘ। সমস্ত অঞ্চল পর্ব্বতময় এবং পর্ব্বতশ্রেণী খুব বেশী উচ্চ না হইলেও গভীর জঙ্গলাকীর্ণ। বৃটিশ আমলে এই সীমান্ত Forgotten Frontier বলিয়া খ্যাত ছিল। এইরূপ হইবার কারণ এই যে ব্রহ্ম বৃটিশ শাসনাধীন হইবার ফলে এই সীমান্তের সামরিক গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বহিঃশত্রুর আক্রমণ, বাণিজ্য অথবা স্থলপথে যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজনেই সীমান্তের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বৃটিশ দ্বীপবাসী বলিয়া তাঁহাদের আমলে উল্লিখিত প্রত্যেকটী ব্যবস্থা সমুদ্রপথে পরিচালিত হইত। সুতরাং অর্দ্ধমানব হিংস্র উপজাতি অধ্যুষিত গভীর জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম অঞ্চলের মধ্য দিয়া রেলপথ অথবা চক্রচালিত যান চলাচলযোগ্য রাস্তা নির্ম্মাণ দ্বীপবাসী বৃটিশ বণিক স্বার্থের দিক হইতে মোটেই প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হয় নাই।

বাণিজ্য চলাচল না থাকিলেও স্থানীয় অধিবাসীরা পার্ব্বত্যপথে পদব্রজে আসাম ব্রহ্মে যাতায়াত করিত। এইভাবে যাতায়াতের যে কয়েকটি পথ বিদ্যমান তন্মধ্যে আসাম সীমান্তবর্ত্তী মণিপুর রাজ্যের মধ্য দিয়া যে পথটি গিয়াছে সামরিক দিক হইতে উহাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীনে গঠিত আজাদ হিন্দ্ ফৌজ

এই পথে ভারতে প্রবেশ করিয়া বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

আরও পূর্ব্ব দিকে গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়া পার্ব্বত্য পথে ব্রহ্ম-চীন সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে গমনাগমন চলে। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহা-সমরের সময় ইউরোপীয় রণাঙ্গনে অতি মাত্রায় বিব্রত বৃটিশ বাহিনীর অসহায়ত্বের সুযোগ জাপ বাহিনী সমুদ্র পথে অত্যন্ত সুরক্ষিত বৃটিশ নৌবাহিনীর সুদৃঢ় ঘাঁটী সিঙ্গাপুরের উপর স্থল পথে আক্রমণ চালাইয়া অতি সহজে উহা দখল করিতে সমর্থ হয়। ইহার ফলে শ্যাম, মালয় ও ব্রহ্ম দেশ হইতে বৃটিশ বাহিনীকে অতি দ্রুত পশ্চাদপসরণ করিতে হইয়াছিল। ইহাতে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির পক্ষে চীনে সরবরাহ প্রদান পথ বন্ধ হইয়া যায়; সরবরাহের অভাবে চীনের পতন ঘটিলে এশিয়ার একটা বিরাট অংশ অতি সহজে ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিবাদের প্রভাব মুক্ত হইয়া জাপ পুঁজিবাদের কুক্ষিগত হইত। অবশ্য ইহা সুদূরপ্রসারী ফল। সরবরাহ বন্ধ হইবার আশু প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা যায়, ইহাতে চীনের সমর শক্তি মারাত্মক রূপে হ্রাস পাইত এবং এই অবস্থার সুযোগে জাপ সমরনায়কগণ চীনের বিভিন্ন রণাঙ্গনে নিযুক্ত সৈন্য বাহিনীগুলি অন্যত্র স্থানান্তর করিতে সমর্থ হইতেন। ইহা যদি বাস্তব রূপ ধারণ করিত তাহা হইলে মনে হয় জাপ ইতিহাসে পরাজয় বরণের অধ্যায় এত করুণ ও মর্ম্মান্তিক হইত না। সে যাহা হউক ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদ ইহা অত্যন্ত গভীর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিল এবং এই বিপর্য্যয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কোটী কোটী মুদ্রা ব্যয়ে তাহারা আসাম সীমান্তের লোডো হইতে চীনের তদানীন্তন রাজধানী চুংকিং পর্য্যন্ত একটী মোটর যান চলাচল-যোগ্য সড়ক নির্ম্মাণের জন্য বদ্ধপরিকর হন। ইহাই 'ষ্টীলওয়েল রোড' নামে বিখ্যাত। এই সড়ক নির্ম্মাণের সাফল্য জাপ পরাজয়ের অন্যতম মুখ্যকারণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সুতরাং দেখা যায়, ভারতের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত পথে চীন ও ব্রহ্ম বাহিনীর পক্ষে অভিযান পরিচালন সম্ভব। তবে ইহাও সত্য যে, অভিযাত্রী বাহিনীকে উচ্চ পর্ব্বত ও গভীর জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলের ভিতর দিয়া সড়ক নির্ম্মাণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতের ন্যায় একটী দেশের বিরুদ্ধে রণ-নিপুণ দুর্দ্ধর্ষ প্রবল রাষ্ট্রের পক্ষেও এই ভাবে অভিযান পরিচালন কিরূপ কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য তাহা অতি সহজেই অনুমেয়। তারপর এই ভাবে শত্রু-বাহিনী আমাদের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইলেও আসাম প্রদেশের পার্ব্বত্য ঘাঁটীগুলিতে অবস্থিত সৈন্য দলকে পরাভূত করিয়া অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে না। আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অত্যধিক শক্তিশালী বাহিনীর পক্ষে প্রচুর রক্ত ও অর্থ ক্ষয় করিয়া আসামের সীমান্তবর্ত্তী কিয়ৎ পরিমাণ ভূভাগ দখল হয়ত সম্ভব হইবে, কিন্তু ভারত জয় অথবা সামরিক দিক হইতে ইহা দ্বারা কোন ক্রমেই লাভজনক বলিয়া গণ্য করা চলিবে না।

তারপর দেখা যায় ব্রহ্মের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে এই রূপ বিপজ্জনক অভিযান পরিচালন আত্মহত্যার সমতুল। একমাত্র চীনের পক্ষে এইরূপ সমর পরিকল্পনা গ্রহণ সম্ভব। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, অভ্যন্তরীণ বহু মুখী ও জটিল সমস্যাগুলি পূরণ করিয়া পররাজ্য গ্রাসের সমর শক্তি অর্জ্জনের ক্ষেত্রে চীনকে আরও কয়েক শতাব্দী কঠোর সাধনায় মগ্ন থাকিতে হইবে।

পাকিস্থানের অভিযান পথ

পাকিস্থান ভারত সীমা বিশেষ বৈচিত্রপূর্ণ। ভারতের সমস্ত উত্তর পশ্চিম সীমান্ত বরাবর যে পশ্চিম পাকিস্থান অবস্থিত ইহা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সামরিক দিক বিচারের জন্য সমগ্র সীমান্তকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা সুবিধাজনক। সীমান্তের উত্তরভাগে কাশ্মীর রাজ্য

-বাসী বহু সংখ্যক মুসলমান পঞ্চম বাহিনীরূপে হানাদারদের সহিত সক্রিয় সহযোগিতা করিয়াছিল।

সে যাহা হউক কাশ্মীরে হানাদারদের আক্রমণের বিভিন্ন দিক আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নহে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হিসাবে কাশ্মীরের মধ্য দিয়া কিভাবে আক্রমণ পরিচালিত হইতে পারে তাহা প্রদর্শনের জন্যই আমি উল্লিখিত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম।

দ্বিতীয় অংশ কাশ্মীর-গুরুদাসপুর সংযোগস্থল হইতে বাহাওয়ালপুর—পূর্ব্ব পাঞ্জাবের ফিরোজপুর-বিকানীর রাজ্যের সংযোগস্থল পর্য্যন্ত প্রায় ১৮০ মাইল বিস্তৃত। এই অংশের শেষপ্রান্ত দিয়া একটি রেলপথ পশ্চিম পাঞ্জাব হইয়া পাকিস্থানের রাজধানী করাচি পৌঁছিয়াছে। এই অংশ উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক বাধাহীন সমতলভূমি বলা চলে। কাজেই ১৮০ মাইল ভূভাগের যে কোন অংশ অথবা সমস্ত অঞ্চল জুড়িয়া আক্রমণ পরিচালন সম্ভব। তবে শুধু আক্রমণ চালাইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে কোন অবস্থায় আক্রমণ পরিচালিত হয় না—আক্রমণের সামরিক লক্ষ্য বস্তু থাকা প্রয়োজন। এই অঞ্চল আক্রমণকারী বাহিনীর সামরিক লক্ষ্যবস্তু কি হইতে পারে, এইবার আমি তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। পূর্ব্ব পাঞ্জাব কৃষি সম্পদে সমৃদ্ধ এবং উক্ত অঞ্চলেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পশম শিল্পের সর্ব্ব বৃহৎ কেন্দ্র অবস্থিত। সীমান্ত হইতে ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রের গ্রীষ্ম কালীন রাজধানী সিমলার দূরত্ব প্রায় একশত মাইল। রাজধানী দিল্লীর দূরত্ব প্রায় ২৫০ মাইল। মহাভারতের যুগ হইতে দিল্লী ভারতের রাজধানীরূপে গুরুত্বপূর্ণ ও খ্যাত। এই দিক দিয়া অগ্রসর হইয়া শত্রুপক্ষ সামরিক দিক হইতে লাভবান হইবার আশা নাই। রাজধানী দখল দ্বারা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নরনারীর মনোবল হ্রাস ও প্রচার কার্য্য চালাইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যদলের উৎসাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দিল্লীকে লক্ষ্যবস্তু করিয়া শত্রুপক্ষ হয়ত অগ্রসর হইবার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে

পারে। অতীতেও দেখা যায় এই পথে দিল্লী অভিমুখে বহুবার অভিযান পরিচালিত এবং পাণিপথের রণাঙ্গনে ভারতের ভাগ্য বহুবার নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে, ভারতে বৃটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ববর্ত্তীকালে সমুদ্রপথে বহির্ভারতীয় বাণিজ্য মুখ্যত আরবসাগর তীরবর্ত্তী সুরাট বন্দর পথে পরিচালিত হইত। কৃষি ও শিল্প সম্পদে সমৃদ্ধ আর্য্যাবর্ত্ত অর্থাৎ উত্তর ভারত হইতে রপ্তানীযোগ্য পণ্য সুরাট বন্দরে প্রেরণ এবং বিদেশ হইতে আমদানীকৃত দ্রব্যাদি উত্তর ভারতে আনায়নের জন্য রাজপুতনার মধ্যে দিয়া যে পথটি দিল্লী পৌঁছিয়াছে উহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্য পথ ছিল। উত্তর ভারত হইতে দক্ষিণ ভারতে গমনাগমণেরও ইহাই একমাত্র পথ ছিল। ইহা ব্যতীত ভারতের মুসলমান নবাব, বাদশাহ, ও সম্রাটগণের পক্ষে মুসলিম ধর্ম্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল সমূহ অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগোষ্ঠির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবার ক্ষেত্রে সুরাট বন্দরের সুবিধা লাভ অপরিহার্য্য ছিল। এই সকল কারণে দিল্লীর বাদশা ও সম্রাটগণকে সুরাট-দিল্লী গমনাগমনের একমাত্র পথের উপর কর্তৃত্ব রক্ষাকারী রাজপুতদের সহিত অশ্রান্ত ভাবে সংগ্রাম চালাইতে হইত। এই কারণেই পাণিপথ, হলদিঘাটের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম কাহিনী ভারতের জাতীয় ইতিহাসে রক্তাক্ষরে চিত্রিত রহিয়াছে। রাজপুত বীরগাথা ভারতীয় নরনারীর অন্তরকে জাতীয়তাবোধ, স্বদেশ প্রেম ও আত্মাহুতির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ রাখিয়াছে এবং অনন্ত কাল ধরিয়া ইহার অত্যুজ্জ্বল রশ্মিজাল ভারতীয় নরনারীর চলার পথকে স্বচ্ছ ও শুভ্র আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত রাখিবে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পাণিপথ রণাঙ্গনে ভারতের ভাগ্য আর ভবিষ্যতে মোটেই নির্দ্ধারিত হইবে না।

শেষ অংশ বাহাওয়ালপুর—পূর্ব্ব পাঞ্জাব-বিকানীর রাজ্যের সংযোগস্থল হইতে কাম্বে উপসাগরের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তন্মধ্যে বাহাওয়ালপুর

সীমান্ত বরাবর গিলগিট হইতে পশ্চিম পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার প্রান্ত পর্য্যন্ত ইহা প্রায় ৩৫০ মাইল। এই সীমান্তের অধিকাংশ অঞ্চল উপজাতি অধ্যুষিত। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতিদের মধ্যে যোদ্ধার সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। তন্মধ্যে প্রায় দুই লক্ষ আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত বলা চলে। উপজাতিগণ মুখ্যত তিনটি দলে বিভক্ত।

(১) চিত্রল, দির, ও স্বোয়াত এই তিনটি দেশীয় রাজ্যের শাসন কর্ত্তা-গণের প্রভাব উল্লিখিত উপজাতিদের উপর অত্যধিক। উক্ত শাসন কর্ত্তাগণ ইচ্ছা করিলে তাহাদের শান্ত রাখিতে সক্ষম। উল্লিখিত উপজাতিরা খাইবার গিরিদ্বারের উত্তর দিকস্থ অঞ্চলে বসবাস করে। মনে হয় তড়াই অঞ্চল দুর্গম এবং আফগানিস্থান হইতে আক্রমণ পরি-চালনের অসুবিধা অত্যধিক বলিয়া তাহারা উক্ত অঞ্চল বাছিয়া লইয়াছে।

(২) খাইবার গিরিদ্বারের উত্তর হইতে ওয়াজিরিস্থানের সীমান্তের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে যে সমস্ত উপজাতি বাস করে তাহাদের যাবতীয় ব্যবস্থা প্রকৃত গণতন্ত্র সম্মত। দলীয় নেতাদের প্রভাব যে তাহাদের উপর পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই উপজাতিরা অত্যন্ত দুর্দ্ধষ ও প্রায়ই গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টায় থাকে। ভারতে প্রবেশের যে পাচটী প্রধান গিরিপথ বিদ্যমান তন্মধ্যে চারিটী উল্লিখিত অঞ্চলে অবস্থিত।

খাইবারের উত্তরে মহম্মদদের বাস। তাহাদের ধর্ম্মের নামে অতি সহজে উত্তেজিত করা চলে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কতক অংশ এবং আফগানিস্থানের কতক অংশ তাহাদের দখলে। তাহাদের অধিকৃত অঞ্চল হইতে পেশোয়ার সমভূমি অঞ্চলে হানা দেওয়া বিশেষ সহজ ও সুবিধাজনক।

তাহাদের প্রতিবেশী হিসাবে উত্তম খেল ও বাজুরিদের স্বভাব অনুরূপ। তাহারা প্রায়ই গোলযোগ সৃষ্টি করে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, খান

আব্দুল গফফর খানের 'লাল কোর্ত্তা আন্দোলন' (বর্ত্তমানে পাক্‌তুন) এই অঞ্চলে সুরু হইয়া অতি সহজে বিস্তার লাভ করে। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে মহম্মদদের উপর বহুবার বিমান হইতে বোমাবর্ষণ করিতে হইয়াছিল।

মহম্মদদের অধিকৃত অঞ্চলের দক্ষিণে আফ্রিদিদের বাস। ইপির ফকির তাহাদের নেতা। এই অঞ্চলের মধ্যেই খাইবার গিরিদ্বার অবস্থিত। তিরা আফ্রিদি ও ওরকজাইদের দখলে। সীমান্ত অঞ্চলে এই সকল উপজাতিরাই সর্ব্বাধিক রণনিপুণ। তাহাদের দলে সশস্ত্র লোকের সংখ্যা প্রায় ৮০ হাজার।

তুরি উপজাতিরা কুরুম উপত্যকায় বাস করে। তাহারা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। তাহাদের চতুর্দ্দিকে সুন্নিরা বাস করে। সুন্নিরা তুরিদের পছন্দ করে না এবং সন্দেহের চক্ষে দেখে।

কুরুমের দক্ষিণে ওয়াজিরিস্থান অবস্থিত। অধিবাসীদের মধ্যে মাসুদ ও ওয়াজিরি প্রধান। তাহাদের সশস্ত্র লোকের সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার।

(৩) ওয়াজিরিস্থানের দক্ষিণে যে সকল উপজাতি বাস করে তাহারা অনেকটা শান্ত এবং কদাচিৎ গোলযোগ সৃষ্টি করে।

কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিলে পাকিস্থান ও পাকিস্থান বাহিনীর সহযোগিতায় উপজাতি দুর্ব্বৃত্ত দল অতি সহজে কাশ্মীরের বিরাট অঞ্চলে ঢুকিয়া পড়িয়া হত্যা, লুণ্ঠন, নারীহরণ ও অগ্নিসংযোগের বীভৎস তাণ্ডব সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়। নিম্নোক্ত কারণে হানাদারেরা প্রথম আঘাতে বিশেষ সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিল। (১) উপজাতি হানাদার দল সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসী। (২) জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকায় প্রবেশের সমস্ত রাস্তা ও গিরিদ্বার পাকিস্থান ও উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত। (৩) এইরূপ অতর্কিত হানার জন্ত কাশ্মীর অথবা ভারত সরকার মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। (৪) কাশ্মীর-

করিয়াছি। এই অবস্থায় দেখা যায় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত পাকিস্থানের সংগ্রামে বাঁধিলে পাকিস্থানী বাহিনী অতি সহজে আসাম প্রদেশকে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে সমর্থ হইবে। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে এই ক্ষেত্রে সৈন্য ও অস্ত্র বল মুখ্য নহে। ভৌগোলিক অবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এই অবস্থা পূর্ব্ব পাকিস্থানের পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

আসামকে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য পাকিস্থান বাহিনীর আক্রমণ কি ভাবে পরিচালিত হইবে এইবার আমি সেই আলোচনার প্রবৃত্ত হইব। প্রথমতঃ পাকিস্থানবাহিনী রঙপুর-দিনাজপুর সীমা বরাবর পশ্চিমে পূর্ণিয়া জেলার উপর আক্রমণ চালাইয়া ন্যুন পক্ষে দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে কুশী নদী ও উত্তরে মোবাংএর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলটি দখল করিতে সচেষ্ট হইবে। ইহাতে দার্জ্জিলিং-জলপাইগুড়ি সহ সমস্ত আসাম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি শক্তিশালী বাহিনী ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীর ধরিয়া বড়পেটার পথে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। শ্রীহট্টের সীমান্তে অবস্থিত সৈন্যদল আসাম রেলপথ ধরিয়া নাগাপাহাড় অঞ্চল দিয়া ব্রহ্মপুত্র তীর ধরিয়া অগ্রসরমান বাহিনীর সহিত যুক্ত হইতে সচেষ্ট হইবে। রঙপুর সীমান্ত হইতে অপর একটি বাহিনী ধুবরীর ভিতর দিয়া অবশ্যই আসাম রেলপথ ধরিয়া অগ্রসর হইবে। লুসাই পাহাড় অঞ্চলে অবস্থিত সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও অভ্যন্তর ভাগে আটক সৈন্যদের পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের মধ্য দিয়া কর্ণফুলির উজানী পথে অপর একটি বাহিনী শিলচরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইবে। বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া এই ভাবে দেখা যায় আমাদের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ প্রথম আঘাতে বিপন্ন এবং যুগপৎ বিভিন্ন দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া গভীর ও জটিল সঙ্কটের সম্মুখীন হইবে।

এই অবরোধের ফল অত্যন্ত মারাত্মক। কারণ বিমান পথে সরবরাহ এবং বেতার যোগে সংবাদ আদানপ্রদান ব্যতীত সরবরাহ ও যোগাযোগ রক্ষার কোন পথ উন্মুক্ত থাকিবে না। এই অবরোধ ব্যূহ ভেদ করিবার জন্য ভারতীয় বাহিনীকে বিহার-বাঙলা সীমান্ত হইতে কঠোরতম সংগ্রাম চালাইয়া ১৫০ হইতে ২০০ মাইল অগ্রসর হইবার পর ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে পৌছিতে হইবে। ভারতীয় বাহিনী এইখানে পৌছিলেই যে উক্ত অবরোধ ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহা নহে। ব্রহ্মপুত্র আসাম প্রবেশের পর অনেকটা সোজা পশ্চিম বাহিনী। প্রদেশের পশ্চিম ভাগ ধুবরীতে পৌছিয়া ব্রহ্মপুত্র যেন হঠাৎ বাম দিকে প্রায় সম-কোণে গতি মুখ ফিরাইয়া সোজা দক্ষিণ বাহিনী।

এই কারণে প্রদেশের বৃহৎ অংশ ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে পড়িয়াছে। মোট ১২টি জেলা লইয়া আসাম প্রদেশ গঠিত। দেশ বিভাগের ফলে তন্মধ্যে শ্রীহট্ট জেলা বিভক্ত। মণিপুর ও খাসিয়া অঞ্চল বাদ দিলে মোট আয়তন প্রায় ৫৫,০১৪ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে ধুবরী, বড়পেঠা, কামরূপ, দারাং এবং লক্ষীপুরের কতকাংশ অর্থাৎ মোট আয়তনের প্রায় এক চতুর্থাংশ মাত্র ব্রহ্মপুত্রের উত্তর ভাগে অবস্থিত। সুতরাং দেখা যায় কঠোরতম সংগ্রাম চালাইয়া অবরোধ ভেদকারী বাহিনী অগ্রসর হইয়া তাহাদের ব্রহ্মপুত্ররূপ বিরাট প্রাকৃতিক বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে। ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীর ধরিয়া অগ্রসর হইয়া অবরুদ্ধ বাহিনীর সহিত মিলিত হওয়া সহজ সাধ্য হইলেও তাহাদের পক্ষে নদী অতিক্রম করা বিরাট সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে। ব্রহ্মপুত্রের আসাম অংশ বিস্তারে এক হইতে চার মাইল এবং বর্ষায় স্থানে স্থানে প্রায় সাত মাইল বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আসাম রেলপথ ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরবর্তী অঞ্চল দিয়া গিয়াছে।

হইতে পালানপুর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া রাজপুতনার থর মরুভূমি অবস্থিত। এই অঞ্চলে সামরিক লক্ষ্যবস্তু কিছুই নাই। তবে দিল্লী আক্রমণকারী বাহিনীকে সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে যোধপুর রেলপথ ধরিয়া শত্রু সৈন্যদল অগ্রসর হইতে পারে। এই অঞ্চলের মধ্যে যশল্মীর রাজ্য সামরিক দিক হইতে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ।

পালানপুর রাজ্য সীমান্ত হইতে কাম্বে উপসাগরের তীর পর্য্যন্ত ২০০ মাইল বিস্তৃত অঞ্চলটির সামরিক গুরুত্ব অত্যধিক। এই অংশে তিন দিক জল বেষ্টিত কাথিয়াবাড় ও কচ্ছ অবস্থিত। কাথিয়াবাড় ও কচ্ছের পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব দিকে কচ্ছের জলাভূমি এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আরব সাগর অবস্থিত। পূর্ব্বদিকে সংকীর্ণ প্রায় ৫০ মাইল স্থলভাগ দ্বারা কাথিয়াবাড় মূল ভূভাগের সহিত সংযুক্ত। জলাভূমির পশ্চিমভাগ অত্যন্ত সংকীর্ণ। এইভাবে প্রায় চতুর্দ্দিক জলবেষ্টিত এবং পশ্চিম পাকিস্থানের সীমান্তবর্ত্তী ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী বলিয়া ইহার সামরিক গুরুত্ব এই সীমান্তে অত্যধিক। সমুদ্র ও স্থলপথ উভয় দিক হইতে ইহার উপর প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ পরিচালন অতীব সহজসাধ্য। পাকিস্থানের যে কোন বিমান ঘাঁটি হইতে ইহার উপর অহোরাত্র অবিশ্রান্তভাবে বোমাবর্ষণ করা চলিবে। মূল ভুভাগ হইতে কাথিয়াবাড় প্রবেশের পথ স্বরূপ ৫০ মাইল স্থলভাগের মধ্যে ভারতের বস্ত্রশিল্পের সর্ব্ববৃহত্তম কেন্দ্র আমেদাবাদ অবস্থিত। পাকিস্থান ভারতের অংশ বিশেষ জয় ও উহা দখল করিবার দুরাকাঙ্খা লইয়া কোন সময় আক্রমণ চালাইলে পালানপুরের ভিতর দিয়াই সে আক্রমণ পরিচালিত হইবে।

এই পথে পাকিস্থান বাহিনীর অভিযান আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে স্বতঃই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্ববৃহত্তম দেশীয় রাজ্য হায়দরাবাদ প্রশ্ন অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। হায়দরাবাদ স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন মুসলিম রাষ্ট্র থাকিলে এবং পাকিস্থান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ

করিলে নিজাম ও নিজাম বাহিনী যে সর্ব্ব অবস্থায় আক্রমণকারী বাহিনীর সহযোগিতা করিবে ইহা ধ্রুব সত্য। এই অবস্থায় পাকিস্থান বাহিনী প্রায় ২৫০ মাইল অগ্রসর হইয়া হায়দরাবাদ সীমান্তে পৌছিতে সমর্থ হইলে কার্য্যত ভারত দ্বিধাবিভক্ত অর্থাৎ দক্ষিণ ভারত স্বরূপ সমগ্র উপদ্বীপ অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। স্থল বাহিনীর অভিযান সুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে আরব সাগর পথে শত্রুপক্ষের নৌ-বাহিনীর আক্রমণ অতি প্রচণ্ড আকার ধারণ করিবে এবং তাহারা কুমারিকা হইতে সুরাট বন্দর পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ উপকুল ভাগের বিভিন্ন স্থানে অবতরণ করিয়া স্থল বাহিনীর সহায়তা ও তাহাদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে সচেষ্ট হইবে। এদিকে স্থলবাহিনী হায়দরাবাদ সীমান্তে পৌছিতে সক্ষম হইলে তাহারা হায়দরাবাদের ভিতর দিয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া নর্দান সার্কাসের উপকূলে মসলিপত্তমে পৌছিতে সচেষ্ট হইবে। সুতরাং স্বাধীন হায়দরাবাদ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে কিরূপ বিপজ্জনক তাহা অতি সহজেই অনুমেয়।

পূর্ব্ব পাকিস্থান

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্ব সীমান্তে একটি বিরাট কীলকাকারে পূর্ব্ব পাকিস্থান অবস্থিত। কীলকের একটি দিক অর্থাৎ দক্ষিণ প্রান্ত বঙ্গোপসাগরের দিকে উন্মুক্ত এবং উত্তর দিক হিমালয়ের প্রায় তড়াই অঞ্চলে পৌছিয়াছে। পূর্ব্ব দিকে আসাম এবং পশ্চিম দিকে পশ্চিম বঙ্গ অবস্থিত। আবার ব্রহ্মের সীমা ভাগে পূর্ব্ব পাকিস্থান এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ আসামের সহিত মিলিয়াছে। আসামের পূর্ব্ব প্রান্তে মহাচীন অবস্থিত। এই কারণে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব্ব সীমান্তের সমস্যা অত্যন্ত জটিল।

পাকিস্থানের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি পাকিস্থানবাসীর মনোভাব কিরূপ তাহা পূর্ব্বেই আমি উল্লেখ

বসবাস স্থাপন ও সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইঁহাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের কাহিনী অনুধাবন করিলে দেখা যায়, মধ্য যুগীয় সামন্ততন্ত্রে বিশ্বাসী, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার দিক হইতে সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী ভারতীয় নৃপতিগণের বৈরিতা ও কলহ সঞ্জাত অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলার সুযোগে তাঁহারা এদেশে রাজ্য বিস্তারের সঙ্কল্প ও নীতি গ্রহণ করেন। ইউরোপীয় শক্তিগুলি এদেশে আগমণ ও রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস ভারতীয় নরনারীর পক্ষে অত্যন্ত অপমানকর, মর্ম্মন্তুদ, করুণ ও শোচনীয়। সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবনের শত পঙ্গুতা ও দৈন্যতা ইহার মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

ভৌগোলিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় ভারত মহাসাগরে প্রবেশের দুইটি স্বাভাবিক পথ এবং একটি কৃত্রিম পথ রহিয়াছে। তন্মধ্যে তিনটি পথের উপরই বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ বিদ্যমান। পশ্চিমে অতলান্তিক হইতে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ পথে দক্ষিণ আফ্রিকা ও বৃহৎ মাদাগাস্কার দ্বীপ এবং পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগরে গমনের পথে ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও ইত্যাদি) ও অষ্ট্রেলিয়া অবস্থিত। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই উল্লিখিত স্থানদ্বয় (উত্তমাশা অন্তরীপ ও ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ) হইতে ভারত মহাসাগরে আগমণ ও নির্গমনের উপর প্রাধান্য বিস্তার এমন কি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। অবশ্য দক্ষিণ দিকে মেরু অঞ্চল পর্য্যন্ত প্রসারিত সীমা হীন সমুদ্র পথে প্রধান্য প্রতিষ্ঠা অথবা নিয়ন্ত্রণ কোন রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রগোষ্ঠির পক্ষে সম্ভব নহে।

তারপর পশ্চিম দিকে সুয়েজ খাল দ্বারা লোহিত সাগরকে ভূমধ্যসাগরের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচীর মধ্যে বাণিজ্য পোত চলাচলের পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ পথ। সুয়েজখাল এশিয়ার অন্তর্ভূক্ত হইলেও কয়েকটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র ইহার উপর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব করেন।

বিশেষ করিয়া জিব্রাল্টার, মাল্টা, এডেন বৃটিশ অধিকৃত বলিয়া ভূমধ্য সাগর ও সুয়েজ খালের উপর তাঁহাদের প্রাধান্য বজায় রাখা বিশেষ সুবিধা জনক।

সুতরাং দেখা যায় বৃটিশ, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ওলন্দাজ সরকার সম্মিলিত চেষ্টার দ্বারা ভারত মহাসাগরকে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে সক্ষম। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র অত্যধিক শক্তিশালী নৌবহর গঠন করিলেও উহার পক্ষে উল্লিখিত অবরোধ ভেদ করা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে।

ভৌগোলিক দিক আলোচনা কালে দেখা গিয়াছে যে, ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রের কন্যা কুমারিকা হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপের মধ্যবর্ত্তী সরল রেখার মধ্যে একটি দ্বীপশৃঙ্খল বিদ্যমান। তন্মধ্যে সিংহল ও ইহার অন্তর্ভুক্ত মালদ্বীপ ব্যতীত ছাগোস আর্কিপেলেগো (বৃটিশ) আমেরেন্টি, সেসিলিস, প্রভাইডেন্স, ফারকুহার, আগালেগা, আলদ্রাবা (বৃটিশ) মাদাগাস্কার (ফ্রান্স) মাস্কারেন্স (বৃটিশ) গুরুত্বপূর্ণ। সামরিক দিক হইতে উল্লিখিত দ্বীপ-শ্রেণীর গুরুত্ব অপরিসীম। এই দিক হইতে উল্লিখিত দ্বীপগুলির গুরুত্ব দ্বিবিধ। (১) অভিযান পরিচালনের ক্ষেত্রে দ্বীপগুলিকে Spring board হিসাবে ব্যবহার এবং (২) এই সকল ঘাঁটীতে অবস্থিত নৌবহর অতি সহজে ভারত মহাসাগরকে দ্বিধা বিভক্ত অর্থাৎ আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগর ও ভারতমহাসাগরের সহিত যোগাযোগ সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে সমর্থ হইবে। তদোধিক সমস্ত আরব সাগর অঞ্চলে নানারূপ উপদ্রব সৃষ্টি ও গোরি বন্দর হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত উপকূল ভাগে হানা চালাইতে পারিবে। ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও ভারতীয় নৌবহরের পক্ষে ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

সুতরাং দেখা যায়, সমস্ত ভারত মহাসাগরকে তিন দিক হইতে অবরোধ করিয়া মধ্য ভাগেও দ্বিধা বিভক্ত করা সম্ভব। এই বিরাট

ইহা গেল পাকিস্থান কর্ত্তৃক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত প্রদেশ দখলের সংগ্রামনীতি। তারপর পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সীমান্ত বঙ্গোপসাগর হইতে হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রায় ৭ শত মাইল দীর্ঘ। সমগ্র অঞ্চল বৃহৎ প্রাকৃতিক বাধাহীন সমতল কৃষিভূমি। মধ্যে মধ্যে সাধারণ জলাভূমি অবস্থিত। সমুদ্রতীর হইতে সরাসরি ৬০ মাইল অভ্যন্তরভাগে এশিয়ার বৃহত্তম নগরী কলিকাতা অবস্থিত। পাকিস্থান সীমান্ত হইতে ইহার দূরত্ব মাত্র ৪০ মাইল। পাকিস্থানের সহিত সংগ্রাম সুরু হইলে এই সাত শত মাইল দীর্ঘ অঞ্চলই রণাঙ্গণে পরিণত হইবে বলা চলে। তবে মধ্যভাগে বৃহৎ পদ্মানদী অবস্থিত বলিয়া রণাঙ্গণ দুইভাগে বিভক্ত থাকিবে।

সামরিক লক্ষ্য বস্তু

এই অঞ্চলে পাকিস্থান বাহিনীর সামরিক লক্ষ্য বস্তুগুলি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রাণসূত্র এই সীমান্তে অবস্থিত বলা চলে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের লৌহ, কয়লা, তাম্র, অভ্র ইত্যাদির খনি ও কারখানাগুলি বিহার প্রদেশের পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের পশ্চিম সীমান্ত জুড়িয়া অবস্থিত। পশ্চিম পাকিস্থানের সীমান্ত হইতে খনি ও কারখানা অঞ্চলগুলির দূরত্ব একশত হইতে সর্ব্বাধিক দুই শত মাইল। তন্মধ্যে কয়লা খনি অঞ্চল সর্ব্বাধিক নিকটে এবং লৌহশিল্পকেন্দ্র জামসেদপুর সর্ব্বাধিক দূরে অবস্থিত।

আসামকে বিচ্ছিন্ন করিবার আক্রমণনীতি বিশ্লেষণ কালেই আমি উল্লেখ করিয়াছি যে পাকিস্থান বাহিনী পূর্ণিয়া জেলা আক্রমণ ও দখলের জন্য সচেষ্ট হইবে। আসামকে বিচ্ছিন্ন করিবার দিক হইতে ইহা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ—এবং অপরিহার্য্যও বটে। পশ্চিম দিকে আক্রমণ পরিচালনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাণীগঞ্জ, আসানসোল, ধানবাদ, ঝরিয়া ইত্যাদি

কয়লাখনি অঞ্চলগুলি সামরিক লক্ষ্য বস্তুর দিক হইতে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। তদুপরি পাকিস্থান সীমান্ত হইতে উল্লিখিত অঞ্চল গুলি নিকটতম। খনি অঞ্চলের ক্ষতিসাধন ও দখলের উদ্দেশ্যে পাকিস্থানী বাহিনী পদ্মার দক্ষিণ তীর ধরিয়া মুর্শিদাবাদ-বীরভূমের পথে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হইবে। এই সমতল ভূমিতে ভাগীরথী নদীই একমাত্র উল্লেখ-যোগ্য প্রাকৃতিক বাধা। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বৎসরের অধিকাংশ সময় মুর্শিদাবাদের বহু স্থানে ভাগীরথী গোযানে অতিক্রম করা চলে। পূর্ণিয়া ও খনি অঞ্চলের পথে আক্রমণ পরিচালিত হইবার কালে পাকিস্থানী নৌবহরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে। গঙ্গার উজানীতে ভাগলপুর, মুঙ্গের পর্য্যন্ত নৌবাহিনী হানা চালাইয়া নানা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং নদীপথের উপর প্রাধান্য স্থাপনে সচেষ্ট হইবে। ইহা ব্যতীত কুষ্টিয়া, রাজসাহী, মালদহ জেলার ঘাঁটিগুলি হইতে পাকিস্থানী বিমান-বহরের পক্ষে খনি অঞ্চলে ব্যাপক হানা পরিচালনা মোটেই কষ্টসাধ্য হইবে না। তদ্রূপ খুলনা, যশোহর, নদীয়া এলাকার বিমান ঘাঁটিগুলি হইতে কলিকাতার উপর অহোরাত্র এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্ববৃহৎ লৌহকেন্দ্র টাটার উপর হানা পরিচালনা সম্ভব হইবে।

সমুদ্র পথ

আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে ভারত মহাসাগর স্বরূপ বৃহৎ জলভাগ অবস্থিত। এই উপকূল সীমা প্রায় আড়াই হাজার মাইল দীর্ঘ। সমুদ্র পথে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণকারী যে কোন নৌশক্তি ইহার যে কোন অংশ দিয়া অভিযান চালাইতে সক্ষম। অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় ভারত সমুদ্র পথে কদাপি আক্রান্ত হয় নাই। কিন্তু এই সমুদ্র পথে ওলান্দাজ, পর্ত্তুগীজ, বৃটিশ ও ফরাসীরা ভারতে আগমন করিয়া

চেঙ্গিস খাঁ ও তৈমুরলঙ্গ ঠিক অনুরূপ ভাবে তুর্কীস্থান হইতে ভারতের বুকে অভিযান চালাইয়াছিলেন। ১৭৩৮ সাল অবধি যে সকল বৈদেশিক শক্তি স্থলপথে ভারত অভিযান চালাইয়া সিন্ধুতটে উপনীত হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে একমাত্র পারস্যের বাবর শাহ ব্যতীত অপর সকলেই তুর্কীস্থান হইতেই ভারত আক্রমণ চালাইয়া উত্তর আফগানিস্থানের হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন। উক্ত অঞ্চলের গিরিদ্বারগুলি সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ১২ হইতে ১৬ হাজার ফুট উচ্চ। এইভাবে তাঁহারা খাইবার গিরিদ্বারের সংকীর্ণ পথে সুলেমান পর্ব্বত শ্রেণী অতিক্রম করিয়া সিন্ধু নদের তটভূমিতে উপনীত হইয়াছিলেন।

সুতরাং দেখা যায় কাশ্মীর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিভিন্ন গিরিপথের ভিতর দিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে বিভিন্ন শক্তি স্থলপথে ভারত আক্রমণ চালাইয়াছিলেন। ভারত বিভক্ত হওয়ায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অর্থাৎ আফগানিস্থানের উত্তর সীমান্ত হইতে দক্ষিণে আরব সাগরের তীরব্যাপী অঞ্চল লইয়া স্বতন্ত্র পশ্চিম পাকিস্থান রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। ফলে উক্ত অঞ্চলের গিরিদ্বারগুলি রক্ষার দায়িত্ব সমগ্রভাবে পশ্চিম পাকিস্থানের উপর আরোপিত হইয়াছে।

সীমান্ত ও গিরিদ্বারগুলি রক্ষার দায়িত্ব পাকিস্থানের, এই কারণে আমরা শুধু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সীমানা রক্ষার চিন্তায় ব্যস্ত হইয়া প্রকৃত সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্পর্কে উদাসীন থাকিতে পারি কি? দ্বিধাহীনভাবে বলা চলে—না, ঐরূপ চিন্তা অথবা মনোভাব পোষণ এবং নীতি অনুসরণ সম্পূর্ণ আত্মঘাতী হইতে বাধ্য। কারণ:—

১। (ক) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পশ্চিম পাকিস্থান ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট গঠিত হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাবের কতকাংশ, সিন্ধুপ্রদেশ ও বেলুচিস্থানকে বিশাল ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া উল্লিখিত স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা হইয়াছে।

(খ) গান্ধার প্রদেশরূপে বর্ত্তমান আফগানিস্থান যে এককালে বিশাল ভারতের অংশ ছিল ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

২। পশ্চিম পাকিস্থান ও আফগানিস্থান উভয়ই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। প্রবল কোন বৈদেশিক রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্র গোষ্ঠি—যথা সোভিয়েট রুশিয়া স্বীয় রাষ্ট্র সীমা সম্প্রসারণ, কম্যুনিজম প্রচারের দ্বারা বিশ্ব-বিপ্লব সৃষ্টি অথবা অপর কোন আদর্শ ও নীতির ধুয়া তুলিয়া ঐ সকল পথে অভিযান সুরু করিলে জনবল, ধনবল ও অন্যান্য দিক হইতে দুর্ব্বল আফগানিস্থান ও পশ্চিম পাকিস্থান একক অথবা যুক্তভাবে সে অভিযান প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইবে না।

৩। অভিযানকারী শক্তি দুর্গম পার্ব্বত্য সীমা অতিক্রম করিয়া সিন্ধুনদ উপত্যকার সমভূমিতে উপনীত হইলে তাহারা ভারত আক্রমণের দ্বিতীয় পর্য্যায় হিসাবে বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ বেগকে অপ্রতিহত করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবেন।

দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা চলে যে, জার্ম্মাণীর সম্প্রসারণ নীতি অর্থাৎ সরাসরি সমুদ্রবন্দর লাভ ফরাসী ও বৃটিশ স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া উল্লিখিত রাষ্ট্রদ্বয় নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক বিশেষ করিয়া হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ও লুক্সেমবার্গের রাষ্ট্রীক সীমা ও সার্ব্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ সতর্ক ও সক্রিয়।

উত্তর সীমান্তের পশ্চিম অংশের বিষয় আলোচনা কালে দেখা যায় তৎসঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অবিচ্ছেদ্য। কারণ উত্তর দিক হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণকারী শক্তিকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বিভিন্ন পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সেই কারণে উত্তর সীমার পশ্চিম প্রান্ত এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্তের সামরিক দিক একই সঙ্গে আলোচিত হওয়া যুক্তিযুক্ত ও বিভিন্ন দিক হইতে সুবিধাজনক।

সুতরাং দুর্গম অথচ কয়েকটি রাষ্ট্রের সীমারেখা প্রায় একই স্থানে

সমস্যা সম্পর্কে ভারতীয় নৌবহরকে সবিশেষ সচেতন থাকিতে হইবে। তবে অভিযান পরিচালনের পক্ষে লোহিত সাগর ও পারশ্য উপসাগরের পথে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দ্বীপ শৃঙ্খল ধরিয়া অগ্রসর হওয়া সহজ। অপর পক্ষে অবরোধ পরিচালনের ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুর, মালয়, ইন্দোনেশীয়া (সুমাত্রা, জাভা ইত্যাদি) ও অষ্ট্রেলিয়ার স্থান অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। আরও দেখা যায় দক্ষিণ পশ্চিম সমুদ্র পথে প্রহরা কার্য্য পরিচালনের জন্য এক মাত্র লাক্ষা দ্বীপ আমাদের অধিকার ভুক্ত। মূল ভূভাগ হইতে ইহার দূরত্ব মাত্র ৩০০ মাইল। ইহা একটি প্রবাল দ্বীপ এবং ইহার আয়তন ক্ষুদ্র।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব সমুদ্র পথ প্রহরার জন্য আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। প্রহরী ঘাঁটী হিসাবে লাক্ষা দ্বীপ অপেক্ষা আন্দামান-নিকোবরকে অধিকতর শক্তিশালী করা সম্ভব কিন্তু সামরিক দিক হইতে আন্দামান অপেক্ষা লাক্ষা দ্বীপের গুরুত্ব বহুগুণ বেশী। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পক্ষে নৌবহরের সাহায্যে অভিযান চালাইবার ইহাই একমাত্র পথ। সুতরাং রক্ষণ ব্যবস্থা সংগঠনের ক্ষেত্রে লাক্ষা দ্বীপকে সকল দিক হইতে অত্যন্ত সুদৃঢ় করিবার জন্য সামরিক ও রাজনৈতিকদূর দৃষ্টিকে বিশেষভাবে কাজে লাগাইতে হইবে।

ইহারই সন্নিহিত অঞ্চলে মালদ্বীপ নামীয় অপর একটি প্রবাল দ্বীপশ্রেণী বিদ্যমান। মালদ্বীপপুঞ্জ সিংহলের অন্তর্ভুক্ত। ভারত মহাসাগরের আরব সাগর অংশ রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব অত্যধিক। কিন্তু দ্বীপমালাটি সিংহলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ভারতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে ইহাকে ব্যবহার করা সম্ভব নহে। সেই হিসাবে সিংহলের স্থানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এইভাবে দেখা যায়, ভারত মহাসাগরকে তিন দিক হইতে অবরোধ করা সম্ভব হইলেও উপকূলসমুদ্রে বাণিজ্যপোত চলাচল ব্যাহত করা মোটেই

সম্ভব হইবে না। উল্লিখিত ভাবে ভারত মহাসাগর অবরুদ্ধ হইলে রাজনৈতিক, সামরিক ও আর্থিক দিক হইতে ভারতীয় নরনারীর জীবনে যে অসুবিধা ও বিপর্য্যয় সৃষ্টি হইবে তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা প্রয়োজন। অবরোধের ফলে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য যে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে তাহা বলা বাহুল্য। তবে ইহার ফলে দেশরক্ষা ব্যবস্থা ও ভারতীয় নর-নারীর প্রাত্যহিক জীবনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে তাহা গভীর ভাবে অনুধাবন করিতে হইলে ভারতের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের উপর সমরশিল্প ও অর্থ নৈতিক জীবন কতখানি নির্ভরশীল তাহা বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এই পুস্তকের দ্বিতীয়খণ্ডে আমি ইহা আলোচনা করিব।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

সে যাহাই হউক, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী ও ইংরেজ কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের তিনটি কাহিনী বাদ দিলে দেখা যায়, বৈদেশিক শক্তির ২৬ বার ভারত আক্রমণের ক্ষেত্রে আক্রমণকারীরা প্রতিবারই উত্তর দিক হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে আক্রমণ চালাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে উক্ত অঞ্চলগুলি সোভিয়েট রুশিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

এশিয়ার রাণী সেমিরামিস খৃষ্ট পূর্ব্ব ২২০০ শতাব্দীতে তুর্কীস্থানের মধ্য দিয়া ভারত আক্রমণের জন্য এক সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৩০ শতাব্দীতে পারস্যরাজ সাইরাশ উল্লিখিত নীতিই অনুসর করিয়াছিলেন। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩৩৪ শতাব্দীতে মহাবীর আলেকজাণ্ডার বিরাট গ্রীক বাহিনী লইয়া পারস্য ও আফগানিস্থানের পথে ভারত অভিযান পরিচালন করিয়াছিলেন। তবে ভারত আক্রমণের পূর্ব্বে তিনি উত্তর ভাগে অক্সাস ও সমরকন্দ জয় করিয়াছিলেন। পরে সিন্ধু নদ অতিক্রম করিয়া লাহোরে উপনীত হইয়াছিলে।

মিলিত বলিয়া অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐ অঞ্চলের কতকাংশ দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির যাযাবর শ্রেণীর উপজাতি অধ্যুষিত বলিয়া ইহার জটিলতাকে বিভিন্ন দিক হইতে পৃথক ও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আফগানিস্থান

রুশ সীমান্তের উত্তরে হিরাট হইতে খাইবার গিরিদ্বার পর্য্যন্ত আফগানিস্থান প্রস্থে প্রায় ছয়শত মাইল। উত্তর প্রান্ত হইতে দক্ষিণ সীমান্ত পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য প্রায় অনুরূপ। মোট আয়তন প্রায় ১৭০,০০৩ বর্গ মাইল। দেশটিকে মোটামুটিভাবে চতুষ্কোণাকার বলা চলে। ওয়াকান অঞ্চলটি উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে পূর্ব্ব দিকে বিস্তৃত। হিন্দুকুশ পর্ব্বত ওয়াকান হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। হিন্দুকুশ পর্ব্বতশ্রেণীই আফগানিস্থানের প্রধান জল সেচক। ইহার পশ্চিম অংশ কোহিবাবা ও বান্দিবাবা শাখা বলিয়া পরিচিত।

হিন্দুকুশ পর্ব্বতশ্রেণীর উত্তর ভাগে অক্সাস নদী পামীর অঞ্চল হইতে উৎপন্ন এবং দেশের উত্তর সীমান্তরূপে প্রবাহিত হইয়া আরল হ্রদে পতিত হইয়াছে। এই নদীপথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টীমার উজানীর দিকে তারমেজ পর্য্যন্ত গমনাগমন করে। মারখাব নদী কোহিবাবা হইতে উৎপন্ন হইয়া কারাকুম মরুভূমিতে শেষ হইয়াছে। এই নদীর গতিপথ ধরিয়া একটি রেলপথ মার্ভ হইতে কুস্কপোষ্ট পর্য্যন্ত গিয়াছে। হরিরুদ কোহিবাবা হইতে উৎপন্ন ও পশ্চিমবাহী এবং হিরাটের সন্নিহিত অঞ্চলে পৌছিয়া পুনরায় উত্তর বাহী হইয়া টেজেণ্ড মরুঅঞ্চলে শেষ হইয়াছে। মাস্হদ হইতে হিরাটগামী পথের একটা দীর্ঘ অংশ উক্ত নদীর তীর ধরিয়া গিয়াছে। হিন্দুকুশের দক্ষিণ ভাগে কুণার নদী পামীর অঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়া জালালাবাদের নিকটে কাবুল নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

কাবুল নদী কাবুলের পশ্চিম দিকে হিন্দুকুশ পর্ব্বতশ্রেণী হইতে উৎপন্ন এবং জালালাবাদ হইয়া একটী সংকীর্ণ গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়া আটক'এ সিন্ধুর সহিত মিলিত হইয়াছে। হেলমন্দ কোহিবাবা শ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণাভিমুখে মরুভূমি সদৃশ Registan অঞ্চলের Seistanএর সমভূমির ভিতর দিয়া জলাভূমিতে মিশিয়াছে।

লোক সংখ্যা

মোট লোক সংখ্যা এক কোটি দশ লক্ষের বেশী। তন্মধ্যে কাবুলে ৮০ হাজার, কান্দাহারে ৬০ হাজার, মাঝারি সরীফে ৪৬ হাজার এবং হিরাটে ৩০ হাজার নরনারীর বাস।

রাস্তা

মটর অথবা চক্রযান চলাচল যোগ্য রাস্তার সংখ্যা আফগানিস্থানে খুব কম। নিম্নোক্ত পথগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

রুশিয় তুর্কীস্থান হইতে:--

(ক) আস্কাবাদ রেল ষ্টেশন হইতে পারস্যের মেসহেদ হইয়া হিরাট পৌছিয়াছে।

(খ) মার্ভ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে একটি রাস্তা জুলফিকার হইয়া হরিরুদ উপত্যকার ভিতর দিয়া হিরাট পৌছিয়াছে। অতঃপর দুর্গম -অঞ্চলের ভিতর দিয়া কাবুল পৌছিয়াছে (২৫০ মাইল)। শক্তিশালী বড় সৈন্যবাহিনী চলাচলের পক্ষে ইহা মোটেই উপযুক্ত নহে।

(গ) কুস্কপোষ্ট রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে আর্দান গিরিদ্বারের মধ্য দিয়া হিরাট পর্য্যন্ত একটি রাস্তা গিয়াছে (৭০ মাইল)। বর্ত্তমানে উক্ত পথ দিয়া যন্ত্র ও চক্র চালিত যান চলাচল সম্ভব।

(ঘ) তারমেজ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে হাইবাক হইয়া একটি পথ আক-রোবাট গিরিদ্বারের ভিতর দিয়া কাবুল পৌছিয়াছে। ঐ স্থান হইতে অপর একটি রাস্তা কুন্দুজ হইয়া খাওয়াক গিরিদ্বারের ভিতর দিয়া কাবুল

আসিয়াছে। উল্লিখিত পথগুলি সংস্কারের দ্বারা মটর চলাচল যোগ্য করা সম্ভব। হিন্দুকুশ পর্ব্বতশ্রেণীর গিরিদ্বারগুলির গড় উচ্চতা ১১ হাজার ফুটের বেশী। বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস মাত্র ঐ পথগুলি বরফাচ্ছন্ন থাকে না।

আফগানিস্থান—ভারত চলাচল পথ

(ক) কাবুল হইতে লান্দিখানা পর্য্যন্ত মটর চলাচল রাস্তা, লান্দিখানা হইতে মটর অথবা রেলযোগে পেশোয়ার (১৫০ মাইল)

(খ) সুতারগর্দান (Shutargardan), পাইওয়ার কোটল (Paiwar Kotal),গিরিদ্বারগুলির মধ্য দিয়া কাবুল হইতে পারচিনার (Parchinar) ১০০ মাইল। ইহা উষ্ট্র চলাচল যোগ্য পথ, শীতকালে বরফাচ্ছন্ন থাকে।

(গ) মীরজাকাই (Mirzakai) গিরিদ্বারের ভিতর দিয়া উষ্ট্র চলাচল যোগ্য একটি পথ গজনী হইতে পারচিনার গিয়াছে। ইহাও শীতকালে বরফাচ্ছন্ন থাকে।

(ঘ) খিদ্দি ঘাকাই (Khiddi Ghakai) গিরিদ্বারের ভিতর দিয়া উষ্ট্র চলাচল যোগ্য একটি পথ গজনী হইতে মাতুন (Matun) ও থল (Thal) গিয়াছে; শীতকালে বরফাচ্ছন্ন থাকে।

(ঙ) কলানি (Kalanni) গিরিদ্বারের ভিতর দিয়া উষ্ট্র চলাচল যোগ্য একটি রাস্তা গজনী হইতে টচি উপত্যকায় গিয়াছে।

(চ) স্বোয়ান্দি (Swandi) গিরিদ্বারের মধ্য দিয়া উষ্ট্র চলাচল যোগ্য একটি সড়ক গজনী হইতে গোমেল গিয়াছে।

(ছ) কান্দাহার হইতে নিউচামান ও কোয়েটা যাইবার একটি রাস্তা আছে। ইহার কতক অংশ যন্ত্রচালিত যান চলাচল যোগ্য।

উল্লিখিত সড়কগুলি ব্যতীত নিম্নোক্ত পথগুলি গুরুত্বপূর্ণ।

(১) কান্দাহার হইতে একটি রাস্তা গজনী হইয়া কাবুল পৌছিয়াছে

(৩৩০ মাইল)। ইহা যন্ত্রচালিত যান চলাচল যোগ্য এবং বৎসরের সকল ঋতুতে যাতায়াত চলে।

(২) হিরাট হইতে ফারা (Farah) ও গিরিস্ক (Girishk) হইয়া একটি সড়ক কান্দাহার পৌঁছিয়াছে (৫৩০ মাইল)। ইহা অপেক্ষাকৃত কম পার্ব্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়া গিয়াছে। সৈন্য বাহিনী পরিচালনের পক্ষে ইহা সর্ব্বাধিক প্রশস্ত। কিন্তু ফারা ও গিরিস্কের মধ্যবর্ত্তী সুদীর্ঘ অঞ্চল জলহীন-মরুভূমি সদৃশ্য।

সুতরাং দেখা যায় রুশিয় তুর্কীস্থান হইতে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আগমনের নিম্নোক্ত পথগুলিই শ্রেষ্ঠ।

(১) আস্কাবাদ হইতে পূর্ব্ব পারস্যের ভিতর দিয়া মেসহেদ—তারপর হিরাট এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া কান্দাহার অথবা মেসহেদ হইতে (Caravan route) মরুপথ ধরিয়া সিয়েজস্থান (Siestan)। অতঃপর দক্ষিণ আফগানিস্থান অথবা বেলুচিস্থানের ভিতর দিয়া ডুজধাপ (Duzdap) কোয়েটা রেলপথ ধরিয়া নুস্কি (Nushki)।

(২) মার্ভ (Merv) অথবা কুস্ক (Kushk) হইতে হিরাট। ইহার পর ফারা ও গিরিস্ক হইয়া কান্দাহার। ফারা-গিরিস্ক অঞ্চল জলহীন বলিয়া দুর্গম।

(৩) অক্সাসের তারমেজ অঞ্চল হইতে আকরোবাট (Akrobat) অথবা খাওয়াক (Khawak ১১,৬০০ ফুট) গিরিদ্বারগুলির ভিতর দিয়া কাবুল।

শেষোক্ত পথটি মটরযান চলাচল যোগ্য এবং বৎসরের সর্ব্ব ঋতুতে যাতায়াতের ব্যবস্থা সম্ভব করিয়া তুলিতে পারিলে রুশ সীমান্ত হইতে সৈন্য বাহিনী প্রেরণের পক্ষে উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পথ হইয়া দাঁড়াইবে।

প্রধান সহর ও সৈন্য ঘাঁটি

(১) কাবুল (৬ হাজার ফুট) পেশোয়ার হইতে খাইবার গিরিদ্বারের ভিতর দিয়া ১৯০ মাইল। খুরামের ভিতর দিয়া কোহাট হইতে ২৩০ মাইল। গজনী হইয়া কান্দাহার হইতে ৩২০ মাইল এবং কোয়েটা হইতে ৪৫০ মাইল।

কাবুল-পেশোয়ার রোডের মধ্যে জালালাবাদ ও ডাক্কা সহর এবং তথায় সৈন্য ঘাঁটি অবস্থিত।

(৩) গজনী (৭৩০০ ফুট) কান্দাহার হইতে কাবুলগামী সড়কের উপর অবস্থিত। বান্নু হইতে ১৩০ মাইল। পাইওয়ারের নিকটে আলিখেল, এবং টচি নদীর উজানীতে উরগান নামক স্থানে এবং খোষ্ট (Khost) প্রদেশের মধ্যে মাতুন'এ সৈন্য নিবাস আছে।

(৪) গজনী—কান্দাহার সড়কের উপর কালাত-ই-গিলঝাই সহর।

(৫) কান্দাহার (৩,৫০০ ফুট) চামান হইতে ৭০ মাইল এবং কোয়েটা হইতে ১৫০ মাইল। চামান হইতে কয়েক মাইল দূরে বলডাক (Baldak) দুর্গে সৈন্যদল রাখা হয়।

(৬) হিরাট (৬ হাজার ফুট) উত্তর আফগানিস্থানের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। হিন্দুকুশ ও এলব্রুজ-এর মধ্যবর্ত্তী মেসহেদ—হিরাট প্রবেশ পথের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্ব্ব আফগানিস্থান প্রবেশের ইহাই প্রধান পথ। রুশিয় রেলওয়ে ষ্টেশন কুস্ক পোষ্ট (Kusk Post) হইতে দূরত্ব ৭০ মাইল। মার্ভ, মেসহেদ, কাবুল গমন পথগুলির সংযোগস্থল।

(৭) মাঝারি সরিফ আফগান তুর্কীস্থান প্রদেশে অবস্থিত। রুশিয় রেলওয়ে ষ্টেশন তারমেজ হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

(৮) ফৈজাবাদ বাদাকসান প্রদেশে ডোরা (Dorah) গিরিদ্বারের মধ্য দিয়া অক্সাস হইতে চিত্রলগামী সড়কে অবস্থিত।

রুশ অভিযানের সম্ভাব্য পথ

কুস্ক পোষ্ট ও তারমেজ রেলষ্টেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কুস্কপোষ্ট হইতে একটি রাস্তা হিরাট, ফারা ও গিরিস্ক হইয়া কান্দাহার পৌঁছিয়াছে।

তারমেজ হইতে আকরোবাট ও খাওয়াক গিরিদ্বারগুলির ভিতর দিয়া দুইটি পথ কাবুল পৌছিয়াছে। প্রথম সড়কটি হিন্দুকুশ পর্ব্বত শ্রেণীর পশ্চিম ভাগের শেষ প্রান্ত দিয়া গিয়াছে; এই কারণে সহজগম্য। কিন্তু ফারা ও গিরিস্কের মধ্যবর্ত্তী সুদীর্ঘ অঞ্চল জলহীন। চামান হইতে কান্দাহার ৭২ মাইল। গিরিস্ক ১৪৭ মাইল—ফারা ৩১২ মাইল—হিরাট ৪৬১ মাইল, কুস্ক পোষ্ট ৫৩০ মাইল।

তারমেজ ও কাবুল হইয়া লান্দিখানার দুরত্ব প্রায় অনুরূপ। কিন্তু ঐ পথে অগ্রসর হইতে হইলে হিন্দুকুশের সুউচ্চ গিরিদ্বারগুলির মধ্য দিয়া আসিতে হইবে। তারমেজ হইতে আকরোবাট গিরিদ্বার ২২০ মাইল। আকরোবাট হইতে লান্দিখানা ৩১৫ মাইল। তারমেজ হইতে খাওয়াক গিরিদ্বার ২৬৫ মাইল। খাওয়াক হইতে লান্দিখানা ২৯৫ মাইল।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পামীর হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বলা চলে। ইহার মধ্যে আফগানিস্থান-উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সংযোগ স্থলই সামরিক দিক হইতে সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইহার দক্ষিণে বেলুচিস্থানের মরু অঞ্চল পশ্চিম পাকিস্থান ও পারস্যের ব্যবধান রক্ষা করিতেছে। আফগানিস্থানের উত্তর-পূর্ব্ব কোণের ওয়াখান (Wakhan) হইতে পশ্চিম পাকিস্থান-আফগানিস্থান সীমান্ত আরম্ভ হইয়াছে। ওয়াখান পশ্চিম পাকিস্থান ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত রুশ সীমান্তের সংযোগ ঘটিতে দেয় নাই। এই স্থান হইতে হিন্দুকুশ পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বিস্তৃত। কাবুল নদীর আগ পর্য্যন্ত উত্তর অঞ্চলের

সুউচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্খলের ভিতর দিয়া চলাচল যোগ্য কয়েকটি গিরিপথ মাত্র আছে।

কাবুল ও খুরুম নদীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলের প্রায় পূর্ব্ব-পশ্চিম বিস্তৃত সফেদ-কোই পর্ব্বত শ্রেণী অবস্থিত। খুরুমের দক্ষিণ ভাগের সীমান্ত অঞ্চলের বিরাট পর্ব্বত শৃঙ্খল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হইয়া সুলেমান পর্ব্বত শ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়াছে। উক্ত সুউচ্চ পর্ব্বত শ্রেণীর পূর্ব্ব দিকে ৫০ হইতে ১৫০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান দিয়া সিন্ধু নদ প্রবাহিত। সিন্ধুর শাখা ও উপনদগুলির উৎপত্তিস্থল ও গতিপথের বিষয় ভৌগোলিক বিবরণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। তম্মেধ্যে কাবুল নদী শ্রেষ্ঠ এবং আটক নামক স্থানে ইহা সিন্ধুতে পতিত হইয়াছে। কুনার ও স্বোয়াত কাবুল নদীর প্রধান শাখা। আরও দক্ষিণে খুরুম নদী কাবুলের দক্ষিণ ভাগের পর্ব্বত শ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া খুরুম প্রদেশের ভিতর দিয়া সিন্ধু নদে পতিত হইয়াছে। আরও দক্ষিণ দিকে ডেরা-ইসমাইল খানের পার্শ্ব দিয়া গোমেল নদী সিন্ধুর সহিত মিলিত হইয়াছে। অবশ্য একমাত্র বর্ষাকালে ইহার স্রোতধারা সিন্ধুতে পতিত হয়। অন্যান্য ঋতুতে ইহার স্রোত-ধারা সিন্ধুতে পৌছিবার বহু পূর্ব্বে শুকাইয়া যায়।

আটকের উজানীতে সিন্ধু গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়া প্রবাহিত। স্রোত-ধারা এত বেগবতী যে নৌ চলাচল অসম্ভব। আটকের ভাটিতে বিস্তার প্রায় ৫০ গজ এবং আরও দক্ষিণে ভাঁটির দিকে কলা-বাগের নিকট ইহার বিস্তর প্রায় ১ মাইল।

বেলুচিস্থান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আফগানিস্থানের মধ্য-বর্ত্তী স্থানের পর্ব্বতাকীর্ণ বিরাট অঞ্চল বিশাল ভারতের (বর্ত্তমান পশ্চিম পাকিস্থান) অন্তর্ভুক্ত হইলেও প্রকৃত পক্ষে উল্লিখিত অঞ্চল ভারত সরকারের শাসনাধীন ছিল না। এই অঞ্চলের

আয়তন প্রায় ২৫ হাজার বর্গ মাইল। মোট লোক সংখ্যা ৩০ লক্ষের বেশী।

উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে নিম্নোক্ত গিরিদ্বারগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিলিক ১৫,৮০০ ফুট, বরোঘিল ১২,৫০০ ফুট, ডোরা ১৪,৮০০ ফুট। ডোরা আফগানিস্থানের ফৈজাবাদ হইতে চিত্রল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মালাকন্দ গিরিপথের ভিতর দিয়া ঐ পথ দক্ষিণ দিকে নওশেরায় পৌছিয়াছে।

বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষের মতে :—The difficulty and altitude of all these Passes is so great that their use by large forces any time is impossible.'

ইহার দক্ষিণে ভারত প্রবেশের সিংহদ্বার স্বরূপ পাঁচটি গিরিদ্বার অবস্থিত।

(১) খাইবার

খাইবার গিরিদ্বারের সড়কটি পেশোয়ার হইতে আরম্ভ হইয়া আফগানিস্থান সীমান্তের লান্দিখানা পৌছিয়াছে। গিরিদ্বার আরম্ভ হইয়াছে জামরুদ হইতে। পেশোয়ার হইতে লান্দিখানার দুরত্ব ৩৫ মাইল। ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যে বাণিজ্য চলাচল এবং সামারিক দিক হইতে ইহাই সর্ব্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পথ। গিরিদ্বারের ভিতর দিয়া একটি রেলপথ ও দুইটি মটর পথ গিয়াছে। জামরুদ, আলি মসজিদ, লান্দিকোঠলের মধ্যবর্ত্তী কয়েক স্থানে সামরিক ঘাঁটি ছিল। পেশোয়ারে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামারিক ঘাঁটি বা ক্যাণ্টনমেণ্ট ছিল। লান্দিখানার পর ডাক্কা নামক আফগান ক্যাণ্টন-মেণ্ট অবস্থিত। এই স্থান হইতে জালালাবাদ হইয়া একটি সড়ক কাবুল পৌছিয়াছে; এই পথে যন্ত্রচালিত যান চলাচল সম্ভব। খাইবার গিরিদ্বারের ভিতর দিয়া পেশোয়ার হইতে কাবুল ২০০ মাইল।

(২) খুরুম

খুরুম গিরিদ্বার দিয়া একটি মটর পথ থল হইতে পারচিনার পর্য্যন্ত গিয়াছে। পারচিনার হইতে কাবুলের দূরত্ব ১ শত মাইল। এই

সড়কের পাইওয়ারকোটল অংশটি তুরতিক্রম্য—উষ্ট্র চলাচল যোগ্য পথ বলিলেই চলে। শীত ঋতুতে ইহা বরফাচ্ছন্ন হইয়া যায়। খুরুম প্রদেশ যে রেলপথ গিয়াছে উহা কুলবাগে সিন্ধু অতিক্রম করিয়াছে। কোহাট পৌঁছিয়া রেলপথের গজের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; উহা থল পর্য্যন্ত গিয়াছে; পারচিনারে স্থায়ী ভাবে একটি সৈন্য বাহিনী রাখা হইত। খুরুমের ভিতর দিয়া থলের সহিত যে যোগাযোগ ব্যবস্থা রহিয়াছে উহা তুরি উপজাতিদের অধিকৃত অঞ্চল। ইহারা শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত।

(৩) টচি

টচি নদীর উপত্যকা দিয়া বান্নু হইতে গজনীগামী সড়কটি অত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলের ভিতর দিয়া গিয়াছে। উক্ত পথকে উষ্ট্র চলাচল যোগ্য বলাই সমীচীন।

(৪) গোমেল

গোমেল গিরিদ্বারের সড়কটি ডেরা ইসমাইল খান হইতে গজনী পর্য্যন্ত গিয়াছে। টচির ন্যায় বড় সৈন্য বাহিনী পরিচালনার পক্ষে ইহা মোটেই যোগ্য নহে; বহুসংখ্যক গিলজাই শীতকালে এই পথে সিন্ধু উপত্যকায় চলিয়া আসে।

(৫) বোলান

বোলান একটি অতি সঙ্কীর্ণ গিরিপথ স্বরূপ; ইহা দৈর্ঘে ৫৬ মাইল। এই পথই সিবি ও কোয়েটার মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। কোয়েটা ভারতের সর্ব্ব বৃহৎ সামরিক ঘাঁটি ছিল। ইহার মধ্য দিয়া একটি রেলপথ ও একটি মটর পথ গিয়াছে। কোয়েটা হইতে আফগানিস্থান সীমান্তবর্ত্তী চামন যাইবার পথটি খোজাক গিরিদ্বারের ভিতর দিয়া গিয়াছে। রেল পথটিও খোজাক গিরিপথের ভিতর দিয়া সুড়ঙ্গ পথে নির্ম্মিত। চামানে একটি সৈন্য ঘাঁটি ছিল—উহার সম্মুখেই আফগানিস্থানের বলডাক দুর্গ অবস্থিত। চামন হইতে কান্দাহার পর্য্যন্ত যন্ত্রচালিত যান চলাচলযোগ্য একটি সড়ক আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দেশরক্ষা সমস্যা

পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় সমূহের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের সর্ব্ব-বৃহৎ স্থলভাগ এশিয়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে দেখা যায়, বৃটিশ ভারতের পুলিসী দায়িত্ব ত্যাগ করিবার সঙ্কল্পের নীতি ও গতিপথ অনুসরণ করিয়া সংখ্যালঘিষ্ঠ ভারতীয় মুসলমান সমাজের দাবী অপ্রতিহত ও বেগবতী হইবার ফলে বিশাল ভারত খণ্ডিত—এবং ইহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে পশ্চিম পাকিস্থান অ-মুসলমান শূন্য; পূর্ব্ব পাকিস্থানের সংখ্যালঘিষ্ঠ নরনারীর জীবন অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক, ভয় ও সংশয়ের বেদনায় দুর্ব্বিসহ। ভূ-স্বর্গ কাশ্মীরের তুষারশুভ্র সিগ্ধ কন্দর হিন্দু-মুসলমানের তাজা রক্তে রঞ্জিত ও পিচ্ছিল। বৃটিশ প্যালেষ্টাইন ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের বালুময় মরুবুক মুসলমান-ইহুদী নরনারীর উষ্ণ শোণিতে কর্দ্দমাক্ত। তুরস্কের আকাশ বাতাস মার্কিন বিমান ও ট্যাঙ্ক বহরের বীভৎস কর্কশ শব্দে কণ্ঠকিত। মিশর ও পারস্যের রাজনৈতিক জীবন গুপ্ত হত্যার বিভিষিকাপূর্ণ, মন্ত্রী-সভার রদবদল নিত্যকর্ম্ম পর্য্যায় ভুক্ত। বৃটিশ অনুকম্পায় যীশুর প্রেম ধর্ম্মে ধর্ম্মান্তরিত কারেন উপজাতি দল সদ্য পরাধীনতামুক্ত জাতীয়বাদী ব্রহ্মের সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীক জীবনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া শুধু ব্রহ্মের নহে—দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার একটা বিরাট অংশের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন করিয়া তুলিতেছে। মুসলমান প্রধান মালয়ের বন-জঙ্গল, রবার বাগিচা ও টিন খনির অন্ধকার গহ্বর রাইফেল, মর্টার ও মেসিনগানের ধোঁয়ায় অন্ধকারাচ্ছন্ন ও দূষিত। ভাগাড়ের শুষ্ক অস্থিখণ্ড চর্ব্বন-জনিত আঘাতে স্বীয় মুখ ক্ষত নিস্রিত রুধিরে তৃপ্ত অনাদৃত গোয়ো

কুকুরটির ন্যায় শ্যাম মহা উল্লাসে স্বীয় বক্ষপঞ্জর চিবাইয়া তৃপ্ত ও ধন্য। ইন্দোনেশীয়াবাসী মুসলিম নরনারীর ভাগ্য ভারত মহাসাগরের উত্থাল বুকের ন্যায় তরঙ্গায়িত। ক্ষুদ্র ইন্দোচীন ক্ষীণ কণ্ঠে আকুল চীৎকারের পর শ্রান্ত অবসাদে ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। জাপান সত্ত অপহৃতা তরুণী কুল-বধুর ন্যায় সুতীব্র অন্তর্দাহ বুকে চাপিয়া পতিতা জীবন যাপনে বাধ্য হইবার অভিশাপ মুক্তির আশায় এখনও নীরবে অশ্রুমুখী। মহাযানী মহাচীন মহা ষড়যন্ত্রের মহা প্যাঁচে পড়িয়া মহা নির্ব্বানের পথে মহাপ্রয়াণের জন্য মহানাদ তুলিতেছে। এশিয়ার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম সর্ব্বত্র যে আজ অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, বিরোধ ও রক্তাক্ত সংঘর্ষ চিরস্থায়ী সর্ত্তে সর্ত্তবান ইহাই কি এই প্রাচীন ভূ-খণ্ডের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও গৌরবময় ঐতিহ্যের স্বাভাবিক পরিণতির পরিপূর্ণরূপ? এশিয়ার প্রান্ত সীমায় দাঁড়াইয়া অবশিষ্ট বিশ্বকে বাদ দিয়া শুধু ক্ষয়িষ্ণু আদিবাসী অধ্যুষিত আফ্রিকা, অদিবাসীহীন অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড ইত্যাদি অঞ্চলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে ঐ সকল স্থানে শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান বহিরাগতের সংখ্যা বৃদ্ধি, সংগঠন, ঐক্য ও উন্নয়নের যে গভীর প্রেরণা ও সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে এশিয়াবাসীর সম্মুখ হইতে সংশয়ের কালো যবনিকা অতি দ্রুত বিলীন হইয়া যায়। পুঁজিবাদী সভ্যতার অন্তর্দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত ইউরোপ পুনর্গঠনের ঐকান্তিকতা ও সজীবতা লক্ষ্য করিলে একটি সত্য দিবালোকের ন্যায় তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে যে, বাষ্পীয় পোতে আরোহণ করিয়া যে পুঁজিবাদ একদিন প্রস্তর-যুগের পাষাণ প্রাচীর নিঃশেষে ধূলিসাতের পর ছুটিয়া চলিয়াছিল আজ তাহা আণবিক শক্তি মদমত্ত হইয়া লৌহ দানবকে দলিবার জন্য লক্ষ বাহু বিস্তার করিয়া ধাবিত হইতেছে। আণবিক শক্তিধর পুঁজিবাদের বিশ্বাসের দানা আজ এইভাবে সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে যে, সাম্রাজ্য ব্যতীতও পুঁজিবাদ টিকিয়া থাকিতে ও বিস্তার লাভ করিতে সক্ষম।

শোষণের জন্য শাসন ক্ষমতা বজায় রাখিবার যুক্তি ও নীতির প্রাণ-শক্তি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। আণবিক মন বুঝিতে পারিয়াছে যে, নানা অছিলায় দেশ বিশেষের অভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও ঐক্য বিনষ্ট করা সম্ভব হইলে তথায় উন্নতি ও প্রগতি সমগ্রভাবে ব্যাহত হইতে বাধ্য এবং ইহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বের যে পরিমাণ পুঁজি কেন্দ্রীভূত হইয়া কায়েমী স্বার্থরূপে সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে তাহা অবশ্যই অবিকৃত ও অটুট থাকিবে।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, দ্বিতীয় পুঁজিবাদী মহাসমর বিশ্বকে মুখ্যত দুইটি দলে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। একটি দল ইঙ্গ-মার্কিন সমবায়ের অধীন এবং অপর দল কম্যুনিজম মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েট রুশিয়ার নেতৃত্বাধীন। দুইটি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক আদর্শ অথবা মতবাদ উল্লিখিত দলদ্বয়ের প্রাণবস্তু।

ইঙ্গ-মার্কিন সমবায়ের আদর্শ ও লক্ষ্য কি—গঠনের দিক হইতে ভিত্তি সুদৃঢ় এবং স্থায়িত্ব প্রশ্নাতীত কিনা এই সকল প্রশ্নের বিশদ আলোচনা অবশ্য প্রয়োজন হইলেও উহা অবতারণের যোগ্য ক্ষেত্র ইহা নহে। তবে আমরা দেখিতে পাই, উল্লিখিত ইঙ্গ-মার্কিন সমবায় দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসমরের পরিণতিকে অবলম্বন করিয়া শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান পুঁজিবাদ তথা বিশ্ব পুঁজিবাদের 'অছি' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত হইলেও 'অছি'র মনোভাব ও নীতি অতিমাত্রায় পক্ষপাত দুষ্ট—সংকীর্ণ। একমাত্র শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান পুঁজিবাদের বিশ্ব-জোড়া অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দৃঢ়তর করিবার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প ইহার অণুপরমাণুতে পরিব্যাপ্ত। 'অছি'র কোষাগারে মার্কিন ডলারের প্রভাব যে অত্যধিক ইহা বলা বাহুল্য। তারপর দেখা যায়, অশান্তি গোলযোগ ও সংঘর্ষের মধ্যে সুপরিকল্পিতভাবে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর

বিভীষিকা সৃষ্টি করিয়া ক্ষুধিত ও তৃষিত বিশ্ব নরনারীকে মার্কিন ডলার প্লাবনের লবনাক্ত গণ্ডুষবারি পানে তৃপ্ত হইতে বাধ্য করিবার প্রচেষ্টার বুকেই 'অচ্ছির' বিকৃত মনের অবিকৃত সঙ্কল্প দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। বিশ্বের অশ্বেতাঙ্গ জাতিপুঞ্জ বিশেষ করিয়া এশিয়াবাসী নরনারীর পক্ষে ইহা শুধু আতঙ্ক জনক নহে—পরম অশুভকর।

সোভিয়েট রুশিয়া বর্ত্তমানে শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান পুঁজিবাদের 'অচ্ছি' ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃপক্ষের একমাত্র প্রতিপক্ষ বলিয়া আমি পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিতেছি। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লিখিত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান বিদ্যমান তাহা ব্যতীত অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য এই যে, কম্যুনিজম দ্বন্দ্ব সমুৎপন্ন জড়বাদ এবং পুঁজিবাদ রহস্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ প্রথম পক্ষ নিরীশ্বরবাদী এবং দ্বিতীয় পক্ষ একেশ্বর অথবা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তৃতীয় অধ্যায়ে আমি উল্লিখিত বিষয়ের অতি সাধারণ আভাষ মাত্র প্রদান করিয়াছি। কিন্তু এই বিষয়টি সর্ব্বাধিক গুরুত্ব-পূর্ণ এবং ইহার বিস্তারিত আলোচনা আমাদের পক্ষে অপরি-হার্য্য। কারণ উল্লিখিত মূলগত পার্থক্যের ফলেই ইঙ্গ-মার্কিন সমবায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত দলগুলি—খৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দু, ও বৌদ্ধ এই চারিটি উপদলে অতি দ্রুত বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। ইহার কারণ এই যে, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অতি সুগঠিতভাবে পরিচালিত সোভিয়েট রুশিয়ার প্রচারকর্য্য শোষিত ও শাসিত অ-শ্বেতাঙ্গ ও অ-খৃষ্টান জাতিগুলির মধ্যে অতি দ্রুত বিস্তারলাভ করিতেছে। তাঁহাদের প্রচারণায় অজ্ঞ চাষী ও শ্রমিক সমাজ অতি সহজে আকৃষ্ট হন। মানুষ যত অজ্ঞই হউক না কেন প্রত্যেকেই লাভ লোকসানের হিসাব অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম। পরিকল্পিত ধন উৎপাদন ও বণ্টন নীতিতে অতি দ্রুত বিশ্বাস উৎপাদন বিশেষ সহজ।

আরও দেখা যায় কম্যুনিষ্ট প্রচারক দল চাষী সমাজ অপেক্ষা শ্রমিকদের মধ্যে কাজ চালাইতে বেশী উদগ্রীব। চাষী সমাজ সঙ্ঘবদ্ধ নহে। অপিচ জন্মান্তরবাদ রহস্যের চাকচিক্যে তাঁহারা সমধিক সম্মোহিত। সমাজবন্ধন তাঁহাদের ব্যক্তিগত পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে নাগপাশে আবদ্ধ রাখিয়াছে। এই সকল কারণে কম্যুনিজম তাঁহাদের মনে খানিকটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিলেও কার্য্যকালে অর্থাৎ বিপ্লব সৃষ্টিমূলক কর্ম্মপন্থা গ্রহণের সময় তাহারা বেপরোয়াভাবে সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারেন না। পক্ষান্তরে শ্রমিকদের খনি, কারখানা ইত্যাদিতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে হয়। এই কারণে চাষী অপেক্ষা তাঁহারা অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধ। পুঁজিবাদী শোষণের ফলে তাঁহাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন নানাভাবে শ্লথ ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। চাষীকুল একাহারী অথবা অর্দ্ধাহারী অবস্থায় প্রকৃতির শ্রী ও শান্তিময় পরিবেশের মধ্যে গ্রাম্য জীবন-যাপন করেন বলিয়া দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের শুচিতা ও পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিতে সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু শ্রমিকদল নগরের শত সহস্র কৃত্রিমতার বুকে কলের চাকার ন্যায় নিয়মিত একঘেয়েমীর রথচক্রে নিষ্পেষিত হন। পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ হইতে দূরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকেন বলিয়া তাঁহাদের চিন্তা ও কার্য্য বহুলাংশে আত্মকেন্দ্রিক হইয়া পড়ে। ইহাতে তাঁহাদের পারিবারিক জীবনের আনন্দ লাভ নষ্ট হইয়া যায়। বিবাহিত জীবনের যাবতীয় আকর্ষণ লুপ্ত হয় এবং যৌন জীবনে নানারূপ বিকৃতি দেখা দেয়। নরনারীর যৌন জীবন বিকৃত হইয়া পড়িলে জীবনের শান্তি ও শ্রী সমগ্রভাবে বিনষ্ট হয়। এই সকল কারণে চাষী অপেক্ষা শ্রমিক সহজে অতি মাত্রায় বেপরোয়া হইয়া পড়েন। কাজেই অনেকটা সঙ্ঘবদ্ধ এই বেপরোয়া সমাজকে কম্যুনিষ্ট ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করা বিশেষ করিয়া সুযোগ্য নেতৃত্বাধীনে দল বিশেষের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রয়োজনে অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করা অত্যন্ত সহজ হইয়া দাঁড়ায়।

ইহা ব্যতীত অপেক্ষাকৃত শান্তি প্রিয়, উদার মতাবলম্বী ও দার্শনিক মানাভাবাপন্ন নরনারীর দল কম্যুনিজমের দ্বন্দ্ব সমুৎপন্ন জড়বাদে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। রহস্যবাদের রক্ষণশীলতায় শত সহস্র ভাবে নিপীড়িত ও ক্লিষ্ট মনে ঐতিহাসিক বস্তুতন্ত্রবাদের পক্ষে ভাবের প্লাবন সৃষ্টি করা অনেকটা স্বাভাবিক। যে যাহা হউক, ইহার বিস্তারিত আলোচনা এই ক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত ও সম্ভব নহে। তারপর দেখা যায় বিশ্বের নারী সমাজ বিশেষ করিয়া পরাধীন এবং বৈদেশিক শাসন ও শোষনের ফলে নিপীড়িত দেশের নারীদের মধ্যে কম্যুনিষ্ট মতবাদ অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে। ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইলে কয়েক খণ্ড পুস্তক রচনা প্রয়োজন। চুম্বক আলোচনায় দেখা যায়, মাতৃ-প্রধান সমাজ জীবনে পুরুষ স্বীয় পুরুষকার বলে বিপ্লব সৃষ্টি দ্বারা পিতৃ-প্রধান সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিবার পর হইতে নারী সম্পত্তিতে পরিগণিত হইয়াছিল। ফলে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহনশীলতার ভিত্তিতে যে 'সুখ নীড়' রচিত হইয়াছিল উহাতে ভাঙার পালা সুরু হয়। যে কোন মনোভাব লইয়া যে কোন দৃষ্টি কোণ হইতে বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলে আমরা অবশ্যই স্বীকার করিতে বাধ্য যে, নারী পুরুষের সম্পত্তিতে পরিগণিত হইবার ক্ষণ হইতেই মানুষের উপর মানুষের প্রধান্য বিস্তার, শাসন ও শোষণ চালাইবার প্রবৃত্তি রূপ পরিগ্রহ করিয়া সবল ও সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল। 'বীর-পূজা' 'ধরিত্রী ও নারী বীর-ভোগ্যা' ইত্যাদি নীতি বাক্যের মধ্যে প্রভুত্ব বিস্তারের অদম্য নেশা, মনুষ্য সমাজের একটি অংশ অপর অর্দ্ধাংশকে বঞ্চিত করিবার অত্যুগ্র স্বার্থপরতা যে ইহার অণুপরমাণুতে পরিব্যাপ্ত ইহা অস্বীকার প্রচেষ্টা নিছক আত্মপ্রতারণা। পুরুষ কি সুযোগে কোন দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে নারীর পায়ে লৌহ নিগড় পড়াইয়া দিতে সমর্থ হইল তাহা অনুধাবন

করিলে দেখা যায়, প্রেম, সৃষ্টি, শান্তি অর্থাৎ স্বামী, পুত্র, সংসার নারী জীবনের সঙ্কল্প—ইহাই তাঁহার সাধনা। কিন্তু স্বার্থপর পিতৃ-প্রধান সমাজ শাসন ও শোষনের নেশায় উন্মত্ত হইয়া প্রেম ও সেবা ধর্ম্মে দীক্ষিতা নারীর জীবনকে শত ভাবে বিকৃত করিয়া তুলিল। সমাজ জীবনের প্রতি স্তরে ক্ষমতার লড়াই রক্তাক্ত অবয়ব গ্রহণ করিয়া কদর্য্য বীভৎসতায় ভরিয়া উঠিল।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাই সমাজ জীবনে হৃদয়হীন রক্ষণশীলতা, শাসন ও শোষণ নীতির অপরিহার্য্য পরিণতি যুদ্ধ-বিগ্রহ নারীকে আজ বিদ্রোহী নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে।

নারীরা আর শুধু মাত্র পুরুষকে আনন্দ প্রদানের অথবা সন্তান উৎপাদন কারী যন্ত্রের পর্য্যায়ে থাকিতে রাজী নহেন। পুরাকালের স্ত্রী শব্দের অর্থে যাহা বুঝায় সেইরূপ স্ত্রী হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণ নারাজ। তাঁহারা পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতার আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন। অতীত আদর্শ ও মত অনুসারে নারী শুধুমাত্র গর্ভধারিনী বলিয়াই সপ্রমাণিত হয়।

ইহা সত্ত্বেও বর্ত্তমান যুগে বহু সমাজতত্ত্ববিদ সামরিকবাদের চাহিদা পূরণের জন্য নারী সমাজকে পুনরায় মাতৃত্বের সেই পুরাতন আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষ ভাবে প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন। সামরিকবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহের উন্মাদনা ক্রমশঃ দূরীভূত হওয়া দূরের কথা মানব জাতিকে নিশ্চিত ভাবে ধ্বংসের পথে পরিচালিত করিতেছে। যুদ্ধ সমাজের শক্তি ও স্বাস্থ্যকে ভয়ঙ্কর ভাবে অপক্ষেত্রে নিয়োগ দ্বারা ক্ষয়িষ্ণু করিয়া তোলে, এই কারণে বিভিন্ন দেশে বিশেষ করিয়া পুঁজিবাদী সভ্যতায় অনুপ্রাণিত শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান রাষ্ট্র গুলিতে জাতির অপব্যয়িত শক্তি অর্থাৎ মহাযুদ্ধের ফলে জন সংখ্যার যে বিরাট

হ্রাস ঘটিয়াছে তাহা কি ভাবে দ্রুত পূরণ করা যায় ইহা বিরাট-সমস্যা রূপে দেখা দিয়াছে। স্বতই কূট রাজনীতিক ও সামরিক পরিকল্পনাকারীদের দৃষ্টি জাতির মায়েদের প্রতি নিবদ্ধ। সমরবাদী দল কর্তৃক অপহৃত জাতির জনবল অর্থাৎ সন্তানদের শূন্য স্থান নারীরা পূরণ করুক ইহাই তাঁহাদের আদর্শ ও দাবী। তাঁহাদের প্রচার বাণীতে আমরা পাই 'সন্তানের বিরহে মাতার অন্তরে যে নিদারুণ বেদনা জাগিয়াছিল, ইহা তাঁহাদের ভুলিয়া যাইতে হইবে। কত কষ্টে, কত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া কি গভীর মমতা লইয়া জননী ধীরে ধীরে সন্তানকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন ইহা তাঁহাদের বিস্মৃত হইতে হইবে।' সেই সন্তানগণকে জননীর বুক হইতে ছিনাইয়া লইয়া বৃহত্তর কর্তব্যের ধুয়া তুলিয়া জাতির ভবিষ্যতদের মহাযুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডে নির্ব্বিচারে আহুতি দেওয়া হইয়াছে। যুগে যুগে আমরা দেখিতে পাই যুদ্ধের খণ্ড প্রলয়ের মধ্যে জাতির জনশক্তি হ্রাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গে নারীদিগকে নানা ভাবে সম্মোহিত করিয়া সেই বিরাট ক্ষতি পূরণে বাধ্য করা হইয়াছে। অবশ্য মানব সভ্যতার প্রাথমিক স্তরেও এইরূপ দাবী উত্থাপিত হইত। তবে সেই যুগের দাবীর অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি মৃত্যুর সহিত সংগ্রাম চালাইয়া জীবনকে অবিনশ্বর, অক্ষয়, অমর করিয়া তুলিবার প্রেরণা সে দাবীর অন্তর বাণী ছিল।

ইভ কর্তৃক আদমকে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করাইবার মূহূর্ত্ত অথবা অপর কোন শুভক্ষণে নরনারীর মিলন বাসরে পরস্পরের পরিচয় জ্ঞাত হইবার পর হইতেই সৃষ্টির পুনঃবিকাশের কলা কৌশল যে বুদ্ধির আয়ত্বাধীন হইয়াছিল ইহা অতীব সত্য। ইহাকে ভিত্তি করিয়াই মানুষ বেপরোয়া ভাবে প্রকৃতির একটানা ধ্বংসলীলার সহিত সংগ্রাম সুরু করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারকে চিরস্থায়ী করিতে

সমর্থ হইল। এই ভাবে নরনারীর 'আকাঙ্ক্ষা' অথবা 'ইচ্ছাশক্তি' অজয় অমর, অক্ষয় হইয়া উঠিয়া প্রকৃতির অণুপরমাণুতে কি শক্তি কি সম্পদ লুক্কায়িত আছে এবং জীবনকে অবিনশ্বর করিয়া তুলিবার অধিকারকে কায়েমী করিবার জন্য কোন্‌টী কতটুকু প্রয়োজন ও উহাদের কি ভাবে আয়ত্তের গণ্ডীতে ফেলিয়া কোন প্রয়োজনের চাহিদা পূরণ করা চলে, ইহারই অভিযান জল, স্থল, ব্যোমে সুরু হইল। এই অভিযানের অগ্রগতিকে যদি মানব সভ্যতার সোপান অথবা স্তর বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহা হইলে মানব সভ্যতার ইতিহাস ও উল্লিখিত অভিযান মূহূর্ত্ত হইতে লিখিতে হয়। প্রারম্ভেই আমরা দেখিতে পাই যে নরনারীর 'আকাঙ্ক্ষা' অথবা 'ইচ্ছাশক্তি' নারীর রক্ত ধারায় সঞ্জীবিত হইয়া তাঁহারই বক্ষ রক্ত ধারার পুষ্ট হইয়া সৃষ্টিকে অবিনশ্বর করিয়া তুলিয়াছে। এই কারণেই স্বাভাবিক ভাবে সন্তানের উপর মাতার অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল। ইহাই মাতৃ-প্রধান যুগ বলিয়া খ্যাত ছিল। পুরুষ তাহার মানসী নারীর মনঃতুষ্টি, অন্তর জয়, সর্ব্বোপরি তাহাকে মানস প্রতিমারূপে সজ্জিত করিবার প্রেরণা লইয়া ধরিত্রীর অন্ধকার বুক চিড়িয়া, সমুদ্রের অতল গহ্বরে ডুবিয়া বাছিয়া বাছিয়া হীরা, মণি, মুক্তা আহরণ করিয়াছিল। ইহা সৃষ্টির অখণ্ড নিয়ম স্বরূপ। প্রাধান্য, প্রভুত্ব ইত্যাদি বিস্তারের অবকাশ ইহার মধ্যে নাই। কে বড় কে ছোট সেই প্রশ্ন এই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবান্তর। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা চলে, চাঁদের নিজস্ব আলোক নাই, সূর্য্যের আলোক সম্পাতে চাঁদ স্নিগ্ধ আলোকচ্ছটায় ঝলমল করিয়া উঠে; রবিকর তাপে দগ্ধ ধরিত্রীর বুক শান্ত, স্নিগ্ধ হয়। চাঁদ যদি অভিমান করিয়া রাগ ভরে সূর্য্যদেবকে বলেন 'তোমার আলোক চাহিনা' সেই সঙ্গে সূর্য্যদেবও বলিয়া উঠেন 'নাই বা দিলাম তোমায় আলোক' ইহার ফল কি দাঁড়াইবে? পৃথিবীর শান্তি শ্রী

সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাইবে। ধরিত্রীর জীবকুলের জীবন একান্ত ভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িবে। ইহা লক্ষ্য করিয়া সূর্য্যদেব সখেদ স্বরে অবশ্যই বলিতে বাধ্য হইবেন, 'জীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন সম্ভব হইল না।' চাঁদও ব্যর্থতার ভাঙা বুকে বলিয়া উঠিবেন' জীবনটা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইল'। সুতরাং নারী মাতৃত্বের মহীয়সী আসন ত্যাগের দাবী, ইহা অস্বীকারের মূহূর্ত্তটি সর্ব্বপেক্ষা অশুভক্ষণ—বিশ্বের ঘোরতর দুর্দ্দিন।

তারপর যুদ্ধকালীন সময়ে দেখা গিয়াছে যে, নারীদের বহুক্ষেত্রে পুরুষের শূন্যস্থান পূরণ করিতে হইয়াছিল। সমাজে তাঁহাদের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। প্রথম বিশ্ব মহাসমর পরিসমাপ্তির পর রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য তাঁহারা ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে বহুসংখ্যক লোকের মৃত্যুর ফলে ইউরোপে নারীরা প্রায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছিল।

তারপর ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, যুদ্ধের সময় নারীদের নির্লজ্জ বেহায়াপনা, ততোধিক যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি প্রবল প্রেমাসক্তি ইউরোপীয় সমাজ জীবনে একটা গভীর সমস্যারূপে দেখা দিয়াছিল। যুদ্ধবন্দীর প্রতি প্রেমাশক্তি সহজ বুদ্ধিতে প্রকৃতপক্ষে দুর্ব্বোধ্য। 'কিন্তু যদি ধরা যায় যে, পুরুষের চিন্তা ও ভাবধারা সম্পর্কে নারীদের ইহা অন্যতম সবল প্রতিবাদ তাহা হইলে ইহার অর্থ অত্যন্ত সহজ ও সরল হইয়া উঠে। ইহা হইতে আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারি যে শত্রুদের প্রতি পুরুষের বিরূপ মনোভাবের বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ তাঁহারা স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবেই জানাইয়াছেন। নারীই প্রথম শত্রুকে মিত্র রূপে অভিনন্দন দিয়াছেন। পুরুষের দেশপ্রেম নিঃসংশয়ে ব্যর্থ হইয়াছে।

উল্লিখিত প্রতিক্রিয়ার সুতীব্র সংঘাত এশিয়া তথা ভারতীয় সমাজ জীবনেও গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় মহা-

সমরের প্রত্যক্ষ প্রভাব ভারতের বুকে প্রতিফলিত না হইলেও পরোক্ষপ্রভাব নানাভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা, বিবাহ প্রথার অন্তর্ঘাতী নীতির ফলে সমাজ জীবন নানাভাবে বিপর্য্যস্ত। তদুপরি যুদ্ধের ফলে দেখা গিয়াছে যে, ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকার বলিতে কিছু নাই। যুদ্ধের সময় নরনারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকার সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়—এমন কি আত্মরক্ষার সাধারণ অধিকার পর্য্যন্ত স্বীকৃত হয় না—থাকে না। রাষ্ট্র সর্ব্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। যুদ্ধের ফলে পানাহার, অর্থ ও ইন্দ্রিয় লিপ্সা ইত্যাদি অবিশ্বাস্যরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফলে যৌন স্বাধীনতা অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া উঠে। প্রথম মহাসমরের বহু পূর্ব্বে যৌন জীবনের ক্ষেত্রে উল্লিখিতরূপ জঘন্য ও ভয়াবহ অবস্থা রুশিয়ায় দেখা দিয়াছিল। রুশিয়ার যুব সমাজ 'নিহিলিজম' ত্যাগ করিয়া 'সানিজম' (Shanism) এর ধুয়া তুলিয়া অবাধ প্রেমের নেশায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার মারাত্মকরূপ সমাজ জীবনকে ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছিল।

রুশ মার্কা কম্যুনিষ্ট মতবাদের ধারা অবলম্বন করিয়া হৃদয়হীন রক্ষণশীলতায় নির্য্যাতীত ভারতীয় নারী সমাজের মধ্যে উল্লিখিত ভাবধারা বর্ত্তমানে অতিদ্রুত বিস্তার লাভ করিয়া সুস্পষ্ট অবয়ব গ্রহণ করিতেছে। সুতরাং রুশ প্রভাবিত কম্যুনিষ্টদলের শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন এবং প্রচার কার্য্যের ফলে তাঁহাদের মধ্যে কম্যুনিষ্ট মতবাদ যেরূপ দ্রুত বিস্তারলাভ করিতেছে, তাহা অপেক্ষা ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দলের নেতৃত্বে পরিচালিত তথাকথিত নারী প্রগতির রূপ ধরিয়া নারীর বিকৃত যৌন সংগ্রাম (Perverted Sex Struggle) যে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিতেছে তাহা শতগুণ বেশী মারাত্মক।

রহস্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বপুঁজিবাদকে দ্বন্দ্ব-সমুৎপন্ন জড়বাদে

বিশ্বাসী সোভিয়েট রুশিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত সবল ও সুগঠিত প্রচারণা এবং তৎফলে সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লব সৃষ্টির কুঠিল ও বক্র প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিতে হইলে বিশ্ব নরনারীকে বিশেষ করিয়া ধর্ম্মপ্রাণ এশিয়াবাসীর মধ্যে বিরুদ্ধ প্রচারকার্য্য অর্থাৎ রহস্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম, আচার, রীতিনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্য দ্বারা নববলে বলীয়ান করিয়া তোলা অবশ্য কর্ত্তব্য। পুঁজিবাদী সভ্যতার জীর্ণ ও শীর্ণ কঙ্কালকে রক্ষা করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। বিশ্ব পুঁজিবাদের 'অছি' শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান পুঁজির একছত্র নায়ক ইঙ্গ-মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষ উল্লিখিত সত্য আজ গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। এই কারণে ইহাকে পুঁজি করিয়া তাঁহারা বিশ্বপুঁজিবাদকে রক্ষা করিবার ধুয়া তুলিয়া বিশ্বময় শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান পুঁজিবাদকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিতেছেন। ধর্ম্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগ দ্বারা স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মে যীশুর প্রেমধর্ম্মে ধর্ম্মান্তরিত কারেন উপজাতিদলের বিদ্রোহ, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বিতাড়ন ইত্যাদি নীতি ও কার্য্য-কলাপের মধ্যে উল্লিখিত মনোভাব অত্যন্ত কদর্য্য অবয়ব লইয়া প্রকাশমান। আরও দেখা যায়, দরিদ্র, অনগ্রসর ও ধর্ম্মান্ধ মুসলিম নরনারীকেই তাঁহারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রধান অস্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার বিভিন্নদিক আমি মধ্যপ্রাচ্যের বিষয় আলোচনাকালে বিশ্লেষণ করিয়াছি। সুতরাং আমরা দেখিতে পাই যে, এশিয়ার তিনটি প্রধান ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি অর্থাৎ মুসলমানেরা ধর্ম্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনের নীতি অনুসরণ করিলে হিন্দু ভারত ও বৌদ্ধ রাষ্ট্রগুলি অবশ্যই আত্মরক্ষায় সচেতন হইয়া অনুরূপ নীতি অনুসরণ করিতে বাধ্য হইবে।

সুতরাং আমরা নিঃশংসয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, পুঁজিবাদ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে সোভিয়েট রুশিয়ার অনুসৃত নীতির

করাল গ্রাস হইতে আত্মরক্ষার জন্ম বিশ্বপুঁজিবাদ ধর্ম্মান্ধতাকেই শেষ রক্ষাব্যূহ গণ্য করিয়া বিকৃত বেদনায় জর্জ্জরিত। এই কারণেই আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, দ্বিতীয় মহাসমরের ফলে বিশ্ব মুখ্যত দুইটি দলে বিভক্ত হইলেও ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষভুক্ত দল অতি দ্রুত ধর্ম্মের ভিত্তিতে চারিটি উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে।

উল্লিখিত রূপ বিভাগ সৃষ্টি হইলে দেখা যায়, ইঙ্গ-মার্কিন সমবায়ের অধীন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্বেতাঙ্গ-খৃষ্টান পুঁজিবাদ নিঃসংশয়ে স্বীয় অধিকার ও প্রতিষ্ঠা অক্লেশে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইবে। কারণ ইহার ফলে তাহাদের উভয় উদ্দেশ্য সফল হইবে। প্রথমতঃ সোভিয়েট বিরোধী সংগ্রাম (সশস্ত্র, অর্থ-নৈতিক ও কূট-নৈতিক) পরিচালন ক্ষেত্রে তাঁহারা এশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল নরনারীর সবল ও সক্রিয় সমর্থন লাভ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্ম্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন প্রচেষ্টা বেগবতী হইয়া উঠিবার ফলে মধ্য-যুগীয় ধর্ম্মোন্মত্ততা বিশ্ব-পুঁজিবাদের 'অছি'র স্বার্থান্ধ, সক্রিয় ও সবল সমর্থন লাভ করিয়া উন্নতি ও প্রগতির পথকে কণ্টকিত করিয়া তুলিবে। অর্থাৎ সমগ্র এশিয়ায় বিরোধ, বিশৃঙ্খলা ও সশস্ত্র-সংঘর্ষ চিরস্থায়ী সর্তে সর্তবান হইয়া উঠিবে।

এইবার বিশ্ব-পুঁজিবাদ তথা ইঙ্গ-মার্কিন শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান পুঁজিবাদের প্রথম ও প্রধান শত্রু সোভিয়েট রুশিয়ার নীতি ও কার্য্যকলাপ অনুধাবন প্রয়োজন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমি ইহার সাধারণ আলোচনা করিয়াছি। সূক্ষ্ম সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়। ১৯১৮ সালের বিপ্লবের পর পুঁজিবাদী চক্রান্তের ফলে সম্পূর্ণ এক ঘরে হইয়া শাপে বর রূপ অবস্থার সুযোগে সোভিয়েট রুশিয়ার কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ পরম নিশ্চিন্তে দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাক্য ও কার্য্যের মধ্যে ইহাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, কম্যুনিষ্ট

রুশিয়ার অস্তিত্বই পুঁজিবাদী বিশ্বের বুকে অহোরাত্র শাঁখের করাত চালাইবে। প্রায় একুশ বৎসর এই ভাবে শাঁখের করাত চলিবার পর কম্যুনিজমের অন্যতম প্রধান সূত্র ও কম্যুনিষ্টদের পরম বাঞ্ছিত পুঁজিবাদী অন্তর্দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত অবয়ব গ্রহণ করিয়া ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় পুঁজিবাদী সংগ্রামরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। পুঁজিবাদী বিশ্বের বঞ্চিত ও বিক্ষুব্ধ রাষ্ট্র জার্ম্মাণী বিশ্বের নিপীড়িত সর্ব্বহারাদের একমাত্র আশা ভরসা স্থল সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত অনাক্রমণাত্মক চুক্তিবদ্ধ হইল। বিশ্বের শাসিত ও শোষিত নরনারীর অন্তরে আশার আলো ইন্দ্রধনু রচিয়া তুলিল। অনেকেরই মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, বিশ্ব-পুঁজিবাদের প্রধান ভিত্তিস্থল স্বরূপ বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন ডলারের ঝনৎকার এইবার চিরতরে স্তব্ধ হইবে। কিন্তু নাৎসী সমর দানব রুশ-জার্ম্মাণ অনাক্রমণাত্মক চুক্তির সুযোগে ইউরোপের বুকে বীভৎস তাণ্ডব নৃত্যে বাদবাকী দুনিয়ার নরনারীর অন্তরে বিভিষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করিয়া অত্যল্পকাল পরে পুঁজিবাদী জগতের আতঙ্ক ও ভীতির উৎস কেন্দ্র সোভিয়েট রুশিয়ার বুকে মরণ-কামড় সৃষ্টি করিল।

দ্বিতীয় পুঁজিবাদী সংগ্রামের অন্যতম বিজয়ী-শক্তি সোভিয়েট রুশিয়ার যুদ্ধোত্তর কালীন অভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সমর-কৌশল হিসাবে লাল ফৌজের পোড়ামাটি নীতি অনুসরণে পশ্চাদাপসরণ এবং পরবর্ত্তী অধ্যায়ে জার্ম্মাণ বাহিনী নির্ব্বিচারে ধ্বংস চালাইয়া পিছু হটিবার ফলে কৃষি, শিল্প ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ ইউরোপীয় রুশিয়া প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত। যুদ্ধ-পূর্ব্ব কালীন সমৃদ্ধি পুন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। বৈদেশিক অঞ্চলে প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেখা যায়, সীমান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র কয়েকটি বাল্টিক দেশ ও বল্কান অঞ্চলের অপর কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীক জীবনের উপর রুশিয়ার খানিকটা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বত্রই দেখা

যায়, অবস্থা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। দ্বন্দ্ব, বিরোধ, সংঘর্ষ নানা ভাবে প্রকাশমান। এই অবস্থায় সোভিয়েটের উল্লিখিত প্রভাব প্রতিপত্তির পরিধি ও গভীরত্ব নির্দ্ধারণের জন্য সচেষ্ট হইলে ভ্রান্ত-সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রভুত আশঙ্কা বিদ্যমান।

দ্বিতীয় পুঁজিবাদী মহাসমরের উল্লিখিত রূপ পরিণতি এবং ইহাতে সোভিয়েট রুশিয়ার ভূমিকা লক্ষ্য করিয়া নিরপেক্ষ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, কম্যুনিজমের পক্ষে বিশ্ব-বিপ্লব সৃষ্টি অপরিহার্য্য হইলেও সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ ইহা মোটেই চাহেন না ; অর্থাৎ বিশ্ব-বিপ্লব দ্বারা বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্র ও শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন মোটেই তাঁহাদের কাম্য নহে। অথবা কিরূপ নীতি ও কর্ম্মপন্থা অনুসরণ দ্বারা বিশ্ব বিপ্লবকে বাস্তব রূপ প্রদান সম্ভব সেই বিষয়ে সম্যক ও সুস্পষ্ট ধারণা তাঁহাদের নাই।

আমার বিশ্বাস উভয় অভিযোগই সত্য। বিপ্লবের ক্ষণ হইতে রুশ নেতৃবৃন্দ গভীর বিশ্বাস লইয়া তারস্বরে বিশ্ব বিপ্লব সৃষ্টির সম্মোহন বাণী প্রচার করিতেছেন। অনুসৃত নীতি ও কার্য্য-কলাপের বাহ্যাবরণে অনেকটা সেইরূপ চাকচিক্যও বিদ্যমান ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদী অন্তর্দ্বন্দ্ব কম্যুনিষ্ট দলের পরম বাঞ্ছিত রূপ-পরিগ্রহ করিয়া মহাসমরে পরিণত হইবামাত্র কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ কম্যুনিজমের প্রবলতম শত্রু নাৎসী শক্তির সহিত হাত মিলাইলেন। সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যাহাই হউক না কেন, যে কোন দৃষ্টি কোণ হইতে তাঁহাদের উল্লিখিত রূপ ভূমিকার বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, সোভিয়েট রুশিয়ার জনবল, অর্থবল ও অস্ত্রবলের বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল পুঁজিবাদী রাষ্ট্রত্রয় সমগ্রভাবে বিধ্বস্ত এবং প্রবল শক্তিপুঞ্জ প্রবলতর ও সম্পূর্ণ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইরূপ অবস্থা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের ভূমিকাকে

তাঁহাদের আদর্শোচিত, দুরদৃষ্টি সম্পন্ন ও বিজ্ঞোচিত বলা চলে কি? নিসংশয়ে দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করা চলে,—না। পুঁজিবাদ যে জার্ম্মাণী, জাপান ও ইতালিকে অবলম্বনে বিস্তার লাভ করেন নাই ও সুদৃঢ় হইয়া উঠে নাই এই সত্য মার্ক্সবাদীরাই সপ্রমানের দ্বারা বিশ্ব বাসীর নিকট জোড় গলায় প্রচার করিয়াছেন। উল্লিখিত রাষ্ট্রত্রয় এই ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে শক্তিশালী ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিবাদ অধিকতর সুদৃঢ় হইবে; ইহা যদি সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ পূর্ব্বাহ্নে হৃদয়ঙ্গম করিয়া না থাকেন তাহা হইলে বলিতে হয়, দ্বিতীয় পুঁজিবাদী মহাসমরে প্রকৃত পরাজয় ঘটিয়াছে সোভিয়েট রুশিয়ার। পরাজয়ের অপমান ও আত্মগ্লানিতে নাৎসী, জাপ ও ফাসিস্ত নেতৃবৃন্দ অপেক্ষা বিশ্ববিপ্লব সৃষ্টির মন্ত্রে দীক্ষিত রুশ কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দের হাজার গুণ বেশী ম্রিয়মান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইবার ব্যর্থতা অপেক্ষা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়া অধিকতর পরিতাপের বিষয় এবং সর্ব্ব অবস্থায় নিন্দনীয়।

বিরুদ্ধ মতাবলম্বী দল এই ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রশ্ন তুলিবেন, ইহা ব্যতীত সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের পক্ষে অপর কোন নীতি ও পথ উন্মুক্ত ছিল না। ইহার উত্তরে আমি দৃঢ়তার সহিত বলিব অবশ্যই ছিল। রুশ-জার্ম্মান অনাক্রমনাত্মক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর নাৎসীবাহিনী পশ্চিম রণাঙ্গনে উদ্দাম নৃত্য সুরু করিবার মূহূর্ত্তে লাল ফৌজ পোল্যাণ্ডের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া (১) দার্দ্দানেলিস পথে ভূমধ্য-সাগর (২) পারস্যের মধ্য দিয়া ভারত মহাসাগর এবং (৩) মুখ্যত জাতীয়বাদী ভারত ও চীনে ইউরোপীয় শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে যে বহ্নি ধুমায়িত ছিল তাহাতে ইন্ধন প্রদান করিয়া ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্য ভস্মীভূত করিবার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীভূত পুঁজিকে বহুধা বিভক্ত করিতে সমর্থ হইতেন। ইউরোপীয় বণিক স্বার্থের প্রাণ

সুত্র মধ্যপ্রাচ্যের সুয়েজখাল এবং তৈলনালী বিপন্ন হইলে ইঙ্গ-ফরাসী শিল্প এবং সমর দানবের কি দশা ঘটিত তাহা চিন্তা করিতেও ক্লেশ হয়। জাতীয়তাবাদী ভারতে বিপ্লব সৃষ্টি হইলে বিশ্বপুঁজিবাদ যে তাসের ঘরের স্তায় ধূলিসাৎ হইত, ইহা বলাবাহুল্য মাত্র। অথচ সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ সেই নীতি ও পথ গ্রহণ না করিয়া সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তথাকথিক সমর্থকদলগুলি অর্থাৎ চীনা ও ভারতীয় কম্যুনিষ্টদলকে তাঁহারা পুঁজিবাদের সক্রিয় সমর্থক হইবার নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন। শুধু তাহা নহে এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে সকল জাতীয়তাবাদী শক্তি নানাভাবে বিব্রত ও পর্য্যুদস্ত শাসক গোষ্ঠির বিরুদ্ধে সক্রিয় ও বলিষ্ঠ কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছিল সোভিয়েট ইঙ্গিতে পরিচালিত তথাকথিত কম্যুনিষ্ট দলগুলি পুঁজিবাদী শক্তির সহিত হাত মিলাইয়া জাতীয়তাবাদী দলগুলির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতা ও শত্রুতা করিয়াছিল।

বিরোধী দল হয়ত বলিবেন ঐ রূপ নীতি অনুসৃত না হইলে সোভিয়েট রুশিয়ার ধ্বংস অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইত। ইঙ্গ-ফরাসীর কূট-নৈতিক চক্রান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পোষণে হয়ত জার্ম্মাণীর সহিত হাত মিলাইয়া সোভিয়েট রুশিয়াকে সমগ্র ভাবে ধ্বংস করিবার সঙ্গে সঙ্গে কম্যুনিজমকেও সমাহিত করিত। ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাহি যে, তাহা হইলে কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ যে কূটনৈতিক বুদ্ধি লইয়া জার্ম্মাণীর সহিত অনাক্রমনাত্মক চুক্তি বদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা নিতান্ত অন্তঃসারহীন—সম্পূর্ণ অপরিপক্ক। একুশ বৎসর ধরিয়া মার্ক্সীয় দর্শন অনুশীলন করিয়া রুশিয় বিদ্যাবুদ্ধি সর্ব্বোপরি নৈতিক বল৷ অবিশ্বাস্যরূপে পতনের নিম্নস্তরে উপনীত। অন্যথায় বলিতে হয় তাঁহারা একান্ত অসহায়, আত্মরক্ষার বিকৃত বেদনায় জর্জ্জরিত। শুধু বাগাড়ম্বর চালাইয়া তথা কথিত কম্যু-নিজম বিশ্বাসী দল বিশেষ সৃষ্টি করিয়া গুটি কতক লোক স্বার্থ

সিদ্ধির বিকৃত লোলুপতাকেই জীবনের চরম ও পরম বলিয়া গণ্য করিতেছেন।

এই ভাবে আমরা দেখিতে পাই, পুঁজিবাদী অন্তর্দ্বন্দ্বে ইন্ধন প্রদানের দ্বারা পুঁজিবাদ ধ্বংসের নীতি অনুসরণ করিয়া সোভিয়েট রুশিয়ার কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ নিজেদের দেশ ও জাতির অস্তিত্বকে পর্য্যন্ত সমগ্র ভাবে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং ইহার ফলে শেষ পর্য্যন্ত পুঁজিবাদী কূটনৈতিক প্যাঁচে হাবুডুবু খাইয়া লালফৌজ চরম ত্যাগ স্বীকার দ্বারা পুঁজিবাদী স্বার্থকেই নিরঙ্কুশ ও অপ্রহিত করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাতে পরিষ্কার দেখা যায়, সোভিয়েট রুশিয়ার উল্লিখিত রূপ অসহায় অবস্থার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ দ্বারা নিখিল বিশ্ব বিশেষ করিয়া বিশাল এশিয়ার জাতীয়তাবাদী নর নরনারীর শান্তি সুখ, ঐক্য, উন্নতি ও সমৃদ্ধিবৃদ্ধিকে পদে পদে বিপন্ন করিবার জন্য শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান পুঁজিবাদের 'অছি'র পক্ষে সোভিয়েট রুশিয়ার অস্তিত্ব বজায় রাখা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এশিয়ার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব পশ্চিমে রুশাতঙ্ক অর্থাৎ কম্যুনিষ্টাতঙ্ক তুলিয়া ইঙ্গ-মার্কিন শ্বেতাঙ্গ পুঁজিবাদ যে সর্ব্বনাশা ও নির্লজ্জ রাজনৈতিক জুয়া চালাইতেছে ইহার শেষ কোথায়? এই প্রশ্ন শুধু যে জটিল তাহা নহে, অত্যন্ত ভয়াবহ। দুইটি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী দল স্ব স্ব স্বার্থ অর্থাৎ অস্তিত্ব রক্ষার নগ্ন কদর্য্যতা লইয়া আজ এশিয়ার বুকে উদ্দাম গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। পুঁজিবাদ স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিভেদ, অনৈক্য, বিসৃঙ্খলা ও রক্তাক্ত সংঘর্ষ সৃষ্টি করিতেছে—এবং সোভিয়েট রুশিয়া উল্লিখিত অন্তর্দ্বন্দ্বকে আশ্রয় করিয়া আত্মরক্ষার প্রচণ্ড আত্মঘাতী সংগ্রামের বেদনায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিতেছে। পরস্পর পরস্পরের স্কন্ধে ভর করিয়া পঙ্গু ও অর্থব্ব গতিতে অগ্রসরমান এবং উল্লিখিত দ্বিবিধ স্বার্থের নোংড়ামি ও কদর্য্যতায় শান্তি ও প্রগতিকামী বিশ্ব নরনারী শ্রান্ত অবসাদে ম্রিয়মান।

উল্লিখিত পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশরক্ষা সংগঠনের সামরিক বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে অবশ্যই এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, বিভিন্ন রাষ্ট্র শক্তির রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার রূপ ধরিয়া নিম্নোক্ত শক্তিগুলি বিশ্বের বিভিন্ন অংশে সুস্পষ্ট অবয়ব গ্রহণ করিতেছে :—

(১) শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান পুঁজিবাদের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা।

(২) সোভিয়েট রুশিয়ার বিশ্ব বিপ্লব সৃষ্টির পঙ্গু চক্রান্ত।

(৩) মুসলিম রাষ্ট্র সংহতি।

(৪) বৌদ্ধরাষ্ট্র সংহতি।

ইহাদের একক অথবা যৌগিক শক্তির প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষনীতির প্রভাব ও কার্য্যকলাপের বলিষ্ট সক্রিয়তা আমাদের বিভিন্ন সীমান্তকে নানাভাবে বিপদাকীর্ণ করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং উল্লিখিত চারিটি পক্ষকে বিরুদ্ধ শক্তি গণ্য করিয়া আমাদের আত্মরক্ষার প্রতিরোধ ব্যূহ সংগঠন করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

দেশরক্ষা সংগঠন

স্থলভাগে প্রায় ছয় হাজার মাইল পার্ব্বত্য সীমা এবং সমুদ্র পথে প্রায় আড়াই হাজার মাইল উপকূল অঞ্চল বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভারতের জনবল হিসাবে ত্রিশকোটি নরনারীর শারীরিক, মানসিক ও অর্থ নৈতিক শক্তিকে সুগঠিত ও সুদৃঢ় করা শুধু দুরূহ নহে, অত্যন্ত জটিল। দেশরক্ষা সংগঠনের অর্থ সমর সজ্জা। বহু নরনারী 'সমর সজ্জা' বাক্যটি উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তাহারা মনে করেন ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য পররাজ্য গ্রাসের প্রস্তুতি। কিন্তু আমি প্রারম্ভেই উল্লেখ করিয়াছি যে, আত্মরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ও বলিষ্ট করিয়া তুলিতে হইলে পাল্টা আক্রমণ পরিচালন শক্তিকে সর্ব্বদিক হইতে সুসংবদ্ধ করিয়া তোলা কর্ত্তব্য। সর্ব্বকালে সর্ব্ব অবস্থায় উল্লিখিত যুক্তি অভ্রান্ত ও অকাট্য। অর্থ নৈতিক বিষয় আমার বর্ত্তমান আলোচনার বিষয় বস্তু নহে।

দেশ ও জাতির সমর শক্তি সংগঠনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্ব প্রথম সংগ্রাম সৃষ্টির মূলগত 'হেতু'র ভিত্তিতে ইহার শ্রেণী বিন্যাস প্রয়োজন। এই ভিত্তিতে সংগ্রাম নিম্নোক্ত ভাবে বিভক্ত :—

(১) পূর্ব্ব অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আক্রমণাত্মক সংগ্রাম। (Offensive wars to Recover Rights)

(২) রাজনৈতিক দিক হইতে আত্মরক্ষামূলক কিন্তু সামরিক দিক হইতে আক্রমণাত্মক সংগ্রাম (Wars which are Politically Defensive and Militarily offensive)

(৩) মিত্রশক্তি সহ অথবা একক সংগ্রাম পরিচালন। (Wars with or without Allies)

(৪) প্রভাব বিস্তারমূলক সংগ্রাম। (Wars of Intervention)

(৫) পররাজ্য জয় অথবা অপর কোন উদ্দেশ্যমূলক সংগ্রাম। (Wars of Invasions through desire for conquest or other causes.

(৭) জাতীয় সংগ্রাম (National wars)

(৮) গৃহযুদ্ধ (Civil wars)

সমরবাদীদের বাণীতে আমরা পাই :—

"The youngmen shall fight: the marriedmen shall forge weapons and transport supplies; the women will make tents and clothes and will serve in the hospitals; the children will make up old linen into lint; the oldmen will have themselves carried into the public squares to rouse the courage of the fighting-men, to preach hatred against the enemy and the unity of our own people.

"The public buildings shall be turned into barracks, the public squares into munition factories; the earthen floor of cellers shall be treated with lye to extract salt peter."

"All fire arms of suitable calibre shall be turned over to the troops; the interior shall be policed with shot guns and with cold steel."

"All saddle horses shall be sized for the cavalry;

all draft horses not employed in cultivation will draw the artillery and supply wagons.

ইহার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া Hoffman Nikerson "The Armed Horde" (1793—1939) পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"If all wars must be the trreific affairs with which we are to day too familiar, then to admit war to be necessary would be counsel of despair. Happily this not true. War is not always the same. Through out history it has passed through different phases and will doubtless pass through many more.

"Oddly enough, our time which in most matters emephasises changing rather than unchanging things, usually talks of war as if it changed little except for new weapons. On the contarary, it also changes in obedience to religions, moral and special changes which are perpetually soothing odd quarrels or rising new ones. The interaction between these and the technical military changes determines each new phase of conflict. Thus nothing is more characteristic of any society then its military system and its armed struggles. There you find reflected its industrial techuique, power of organisation, and moral driving forces, fused into a single effect.

এই কারণে আমরা দেখিতে পাই যে, বৃক্ষের ডালপালা, ও প্রস্তর খণ্ড সাহায্যে শত্রুর কবল হইলে আত্মরক্ষাকারী নরনারীর সন্তানসন্ততিগণ

আণবিক শক্তি লইয়া জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ। প্রথম বিশ্ব মহাসমরের শেষভাগে রণাঙ্গণে বিমান শ্রেণীর আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া যুদ্ধোত্তর কালে প্রসিদ্ধ ইতালির সমর নায়ক General Vauthler Douhet লিখিয়াছেন :—

"Flying can so modify the teachuiqe of future warfare that only the brodest general principales of previous military thought remain unaltered. The whole Military policy of nations preparing for war must be examined in a new light. War is one. Its single object victory, is achived by imposing one's will upon one's enemy, no matter by what means. The base of all armed effort is the nation itself, from the resources of which all preperation and combat are nourished. Conversely the first quastion to be decided is :--What posible combination of the various forms of armed effort will give up best chance of victory ? Not necessarily victory over an enemy's armies and fleets, but over a hostile nation considered as a whole.

Formerly this questions was simple. There were only two sorts of organised force, the Army and the Navy, which overlapped very little. Within gun shot range fleets could bombard a coast or shore batteries, a fleet, but in strategy a government had to decide only what proportion of its available funds should be spent on increasing its chances of success or reducing

the risks of failure by land or sea. The air plane has complicated matters because within its radius of action it knows no obstacles and can fly equally well over land and water. Moreover it can attack the enemy's rear areas, his bases and the interior of his country. Thus it can act in no less than four fields :—independent attack, or to protect its home land against hostile air attacks or to support its own army or its own navy, so that its strategy is more flexible than that of any surface force. It is a peculiarly offensive weapon, for in the air as on the high seas there are no defensive positions within which a smaller can holdout for sometime against attacks by a larger force. Also its mobility and the number of objectives open to it on hostile territory make it strategically more effective in attacking such territory than in protecting its own, for planes intent on protecting their own country must be widely scattered in order that some of them may be in time to meet the attackers over whatever spot the latter may strike, where as the attackers can concentrate.

*   *   *   *   *

Only the plane therefore is now really capable of the offensive which is the soul of war.

* * * * *

By a second coincidence the new possibility of attacking the hostile rear areas at a time when mass or totalitarian warfare, turning whole nation into a supply departments for their armed forces, has blurred the old distinction between civilians and fightingmen. If one makes a knife and gives it to another so that the second man may commit a murder, both will be hanged if caught. So girls working in a munition factory are as legitimate tergets for bombs as the soilders who shoot off the munitions. Indeed it is difficult to drop a bomb any where in hostile territory without hitting some one whose labour is important to hostile armed forces.

Moreover the great cities in which modern life concentrated are ideal targets. Their great size makes them easy to hit, and few of their buildings are proof against either poison gas or explosive bombs. Their emotional populations are subject to panics, which will be increased if gas is used against them. There is therefore a chance that life might be made so intolerable for them that they might compel their governments to surrender."

সুতরাং অতর্কিতে বিরাট সাফল্য লাভ করিতে হইলে যুদ্ধ ঘোষিত

হইবার পূর্ব্বেই বিমান হইতে প্রবলভাবে বোমাবর্ষণ চালাইতে হইবে। প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে মহানগরী, বিরাট জনপদ, এমন কি সুউচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী যেমন নিমিষে ধূলিসাৎ হইয়া যায় তদ্রূপ এক দিন প্রত্যুষে বিমান বহর সাহায্যে রাজধানী, প্রধান প্রধান নগর, সহর, শিল্পকেন্দ্র ও বিমান ঘাঁটিগুলির উপর অতি বিস্ফোরক বোমাবর্ষণ করিয়া ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিতে হইবে।

কিন্তু বিমান বহর এইভাবে বোমাবর্ষণ দ্বারা মৃত্যু ও ধ্বংসের ভয়াবহ তাণ্ডব সৃষ্টি করিলেও দেখা যায়, বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে ইহার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। ইহা অনুমান করিয়াই :—Ardant du Picq তাঁহার "Etudes Sur Le Combat" পুস্তকে লিখিয়াছেন :—"Modern war is not more but less deadly than ancient fighting, through the improvement of weapons. দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি উল্লেখ করিয়াছেন :—"arm two men with knives and tell them to get a decision, They will do so quickly and bloodily. Arm them with high power rifles and both will take cover and fire at each other for a long time at a cosiderable distance. At last, one will probably make off under cover of darkness."

General Douhet এর কল্পনা যে দ্বিতীয় মহাসমরের প্রত্যেকটি রণাঙ্গনের প্রতিটি পর্য্যায়ে কঠোর বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। হিটলারের নেতৃত্বে পরিচালিত নাৎসী বাহিনীর রণনীতি, রণকৌশল, ও রণসম্ভারের অভিনবত্ব লক্ষ্য করিয়া ১৯৪০ সালের ২১শে মে নাৎসী বাহিনী Abbeville তে উপনীত হইলে ফ্রান্সের সিনেট সভায় প্রধান মন্ত্রী Paul Reynaud ঘোষণা করেন

"The truth is that our classic conception of war

has come up against a new conception. Basic in this new conception is not only massive use of heavy armoured divisions and cooperation between them and aeroplanes, but also the creation of disorder in the enemy's rear by parachute raids······false news and orders given by telephone to the civil authorities······.

"Of all tasks which confront us the most important is clear thinking. We must think of the new type of warfare we are facing and take immediate decisions."

জার্ম্মানদের রণনীতি ও রণকৌশলের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা সর্ব্বাত্মক সংগ্রাম (Total war). Total war নামক পুস্তকে Ludendorff সর্ব্বপ্রথম ইহার চিত্র প্রদান করেন। কিন্তু নাৎসী সমর নায়কগণ সর্ব্বাত্মক সংগ্রামের পরিকল্পনা রচনাকালে মূল পরিকল্পনাকারীর চিন্তাধারা ছাড়াইয়া আরও বহুদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান প্রসঙ্গে F. O. Miksche তাঁহার Blitzkrieg পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"Using machines insted of masses of men, they attack the whole of the forces of the enemy throughout all the territory held by that enemy ; or rather they threaten and disrupt those forces by penetrating deeply into the territory. And they have introduced this same method into the spheres of economics, politics and diplomacy."

As Karl Von Clausewitz states, 'war is the continuation of politics by other means ; and the means

which are effective in war can be effective also in politics, and in economics, with which politics are closely related.'

"The Nazis know the value of infiltration in politics as in battle. Infiltration is the basic method or tactic of German Blitzkrieg..........infiltration is normally first carried out in the economic and political fields before it is attempted in the millitary. The aggressor first seeks out the weakest point in the social structure of the country that is to be his victim ; he uses this weakest point for penetration before war is declared He will work through quite small crevices in the social structure, through quite unimportant individuals, but the forward pressure is continuous and successes are consolidated and broadened as bases for the next penetration……their tactical methods can be summarized as follows ;—attack is superior to defence because it forces the defenders to fight under unfavourable conditions. A really great master of warfare never permits himself to be put on the defensive if he can possibly avoid it : if he decides to take the defensive it is only in order to gain time or to gather material.

হিটলার ও নাৎসী সমরনায়কগণের সমর পরিকল্পনা অর্থাৎ পররাজ্য গ্রাসনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যের যে চিত্র F. O. Miksche প্রদান করিয়াছেন তন্মধ্যে সমর কৌশল ও সমরাস্ত্রের ক্ষেত্রে প্রভূত অভিনবত্ব

ও উৎকর্ষতা পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু তাঁহাদের Infiltration নীতি ও কৌশল অভিনব অথবা অসাধারণ কিছু নহে। ভারতে বৃটিশের সাম্রাজ্য বিস্তার কাহিনীর সহিত যাঁহারা সুপরিচিত তাঁহাদের নিকট হিটলারের Infiltration নীতি ও কৌশল মোটেই বিস্ময়কর নহে। ভারতের সামাজিক, অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৃটিশ Infiltration যে ভাবে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল সেই তুলনায় হিটলারের কৃতিত্ব নগণ্য বলা চলে। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায় যে, ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন মুর্শিদাবাদ হইতে ২৩ মাইল দূরবর্ত্তী পলাশী রণাঙ্গনে বিজয়ী ইংরাজ পক্ষের ২২ জন হত ও ৫০ জন আহত হইয়াছিল। উল্লিখিত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করিয়া বৃটিশ বাঙলার প্রবল পরাক্রান্ত শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার বিরাট বাহিনীকে পরাজিত করিয়া বাস্তব পক্ষে ভারতের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই ঘটনা এবং ইহার পরবর্ত্তী কালে ভারতে বৃটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রত্যেকটি কাহিনীর পক্ষপাতহীন সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, হিটলার ও তাঁহার নাৎসী দল যে কূটনৈতিক বুদ্ধি লইয়া, Franco, Henlein, Ticzo, Degrelle, De la Rocque, Quisling, Szallassy, Besan, Stoyadinovich, Prince Paul, Antonescu, King Boris এর ন্যায় বিশ্বাস ঘাতক ও দেশদ্রোহী (?) এবং Petain, Weygand and Darlan প্রমুখ প্রায় অনুরূপ শ্রেণীর স্বদেশ দ্রোহী সৃষ্টির দ্বারা সমগ্র ইউরোপের (রুশিয়া বাদে) সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক জীবনের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করিয়া অল্প কিছুদিনের মধ্যে ইউরোপ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা বৃটিশ বণিকদল শত সহস্রগুণ কৃতিত্বও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহার বিস্তারিত আলোচনা এই ক্ষেত্রে অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক। পুঁজিবাদী সভ্যতার ধারক ও বাহক ইউয়েপীয় রাষ্ট্র গোষ্ঠির সামাজিক অর্থ-নৈতিক-

ও রাজ-নৈতিক স্বার্থের সংঘাত জনিত অন্তর্দ্বন্দ্ব, গোলযোগ ও বিশৃঙ্খল অবস্থাকে যাঁহারা হিটলার ও নাৎসী দলের কূট-নৈতিক চক্রান্ত এবং সমর কৌশল ও সমরাস্ত্রের অভিনবত্ব দ্বারা ধামাচাপা প্রদান করিতে সাতিশয় উদ্‌গ্রীব তাঁহাদের ভ্রান্তি অপনোদনের উদ্দেশ্যেই আমি উল্লিখিত দৃষ্টান্ত প্রদান করিলাম। সে যাহা হউক, ইউরোপীয় সমরবিদ্‌গণের ভবিষ্যৎ যুদ্ধ সম্পর্কিত যাবতীয় ভবিষ্যৎবাণীকে জীবন্তরূপ প্রদান করিয়া হিটলার ও নাৎসীদল রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। রুশিয়া ব্যতীত অবশিষ্ট ইউরোপ অর্থাৎ কন্টিনেণ্ট জয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই হিটলার Clausewitz-Lndendorff-Douhet নীতির প্রথমাংশ অনুসরণ দ্বারা চরম সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক বড় বড় সহর গুলির উপর অহোরাত্র প্রচণ্ডতম বিমান আক্রমণ পরিচালিত হইলে ভাবপ্রবণ অ-সামরিক নরনারী' ভীত ও আতঙ্কগ্রস্থ হইয়া তাঁহাদের গবর্ণমেণ্টকে আত্ম সমর্পনে বাধ্য করাইবেন বলিয়া Donhet যে ভবিষ্যৎবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে হিটলারের সেই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।

তারপর Blitzkrieg'এর অন্যতম কৌশল they threaten and disrupt those forces by pentrating deeply into territory, কৌশলও সোভিয়েট রুশিয়ায় অভিযান পরিচালন ক্ষেত্রে সমগ্র ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। জার্ম্মাণ সমর নায়কগণের রণ-কৌশলের অভিনবত্ব ও নবাবিষ্কৃত সমরাস্ত্রের প্রচণ্ড মারণ ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া রুশ নায়ক মঁ ষ্ট্যালিন নাৎসী-বিরোধী সংগ্রাম পরিচালনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ গ্রহণ করিলেন। সৈন্য ও অস্ত্রবলের উপর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া তিনি ভৌগোলিক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ শ্রেয় স্থির করিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার দূর দৃষ্টিরই জয় হইল। রুশিয়া বিরাট দেশ, অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই বিরাট ভূভাগ জয় করা সম্ভব নহে। ইহা ব্যতীত সোভিয়েট রুশিয়ার ন্যায় বিরাট দেশের

প্রকৃত গণচেতনা সম্পন্ন ১৮ কোটি নরনারীর স্বাধীনতা হরণ ও অস্ত্রভীতির দ্বারা তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা নাৎসীদলের পক্ষে অসম্ভব বলা চলে।

মঁ ষ্ট্যালিন আরও দেখিলেন হিটলারকে ফ্রান্স, বৃটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে হইবে। সুতরাং তিনি পরাজয়ের পর পরাজয় বরণ করিয়া লালফৌজকে পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ দ্বারা পিছু হাটিবার নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন। এই রূপ নীতি অনুসরণ ও নির্দ্দেশ প্রদান যে অত্যধিক বিপদ সঙ্কুল ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তথাকথিত গণ-তান্ত্রিক কোন রাষ্ট্রের বেতনভুক সৈন্যদলের প্রতি ঐরূপ নির্দ্দেশ প্রদত্ত হইলে চরম বিপর্য্যয় যে অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইত ইহা বলা বাহুল্য, কিন্তু ষ্ট্যালিন বিশেষ ভাবে জানিতেন লালফৌজ বেতনভুক হইলেও গণ-তান্ত্রিক জাতি ও দল গুলির পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা ও সভ্যতার অন্তর্দ্বন্দ্বের অমোঘ অথচ ধীরক্রিয় বিষে দুষিত ও ক্লিষ্ট নহে। তাঁহাদের আদর্শ ও সঙ্কল্পের দানা কঠিন ও স্বচ্ছ। অভিজ্ঞ সেনাপতি মাত্রই স্বীকার করেন যে সৈনিক গভীর ও মহান আদর্শের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ না থাকিলে যুদ্ধক্ষেত্রে· বিশেষ করিয়া আধুনিক রণক্ষেত্রে তাঁহার মনোবল অক্ষুন্ন রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অ-সামরিক জনগণের পক্ষেও উল্লিখিত যুক্তি একান্ত ভাবে প্রযোজ্য। এই কারণে বৃটিশ Admiral Sir Herbert Richmond. Imperial Defence নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন:—……The temper of a people can not be left out of account. To assure the people whose city is being frequently injured, whose lives are being sacrificed, that they have to grin and bear it with the consolation that similar injuries are being inflicted on

the populations of their enemies, is.......very very little comfort. It does not afford sufficient satisfection to one whose house and family have been destroyed to be told that houses of families of the enemy are being destroyed also. He is inclined to reply that that may be, what he wants is protection for himself and if he can not be given it there will be trouble."

সশস্ত্র সৈন্য বাহিনী ও সাধারণ নাগরিক উভয় ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির গভীর আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও যে পরম নির্ভরতা ও অটুট বিশ্বাস লইয়া রুশ রাষ্ট্র নায়ক মার্শাল ষ্ট্যালিন লালফৌজ ও সোভিয়েট নরনারীকে পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ দ্বারা পিছু হাটিবার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মনোবল ও সংগ্রাম শক্তি পূর্ব্বাপর অবিকৃত রাখিয়া শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন ইহা অনুধাবন করিলে পরম শত্রুর অন্তরও সেই প্রতিভাবান পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়।

হিটলার বাহিনী কিরূপ সমস্যাও সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাহা পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, ইহার ফলে চরম আঘাত হানিবার শক্তি লইয়া নাৎসী বাহিনীকে অগ্রসর হইতে বাধ্য করা হইয়াছিল। ফলে নাৎসী সমরনায়কদের বহু জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ ঃ—

(১) জার্ম্মাণীর জনবল, শিল্পউৎপাদন ক্ষমতা, কৃষি ও খনিজ সম্পদ।

(৩) সদ্য দখলকৃত বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলির পুনর্গঠন, শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা।

(৩) অগ্রবর্ত্তী বাহিনী ও মূলঘাঁটি এবং সরবরাহ কেন্দ্র অর্থাৎ খাস জার্ম্মাণীর উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার সহিত যোগাযোগ রক্ষা।

জার্ম্মাণীর মোট জন সংখ্যা ৮ কোটি মাত্র। হিটলারকে এই জনসংখ্যা হইতে সংগৃহীত সৈন্য বাহিনীর বহু লোকজনকে সদ্য অধিকৃত ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রখণ্ডে দখলকার সৈন্য হিসাবে মোতায়েন রাখিতে হইয়াছিল। তারপর আফ্রিকায় রোমেলের অধীনে আফ্রিকা-কোরের আক্রমণ শক্তি অটুট রাখিয়া রুশিয়ার বিরাট ও নানাভাবে বিচ্ছিন্ন রণাঙ্গনে পূর্ব্বাপর আক্রমণ বেগ অব্যাহত রাখিতে হইয়াছিল। অবশ্য কিছু সংখ্যক ইতালিয় সৈন্য তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা নগণ্য।

কৃষি ও শিল্প উৎপাদন ক্ষেত্রে দেখা যায় অত্যধিক উন্নত নিজস্ব কল কারখানা ব্যতীত ইউরোপের সমস্ত শিল্প উৎপাদন কেন্দ্র, কৃষি ও খনিজ সম্পদ নাৎসী কবলিত হইয়াছিল। ইহাও সত্য যে, কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের গুটি কয়েক শিল্প প্রতিষ্ঠান হিটলারের সহিত আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা করিয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, নাৎসী সৈন্যদলকে সঙ্গীন উঁচাইয়া ধরিয়া কলকারখানা এমন কি শস্য ক্ষেত্রে চাষ আবাদ পর্য্যন্ত চালাইতে হইয়াছিল। এই অবস্থায় কৃষি ও শিল্প উৎপাদন হার কিরূপ হইতে পারে তাহা অতি সহজেই অনুমেয়। অতি দ্রুত ভাবে গঠিত বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষুব্ধ কৃষক, শ্রমিকদের সুসংবদ্ধ ও দক্ষ করিয়া তুলিবার ক্ষমতা হয়ত নাৎসী নায়কগণের ছিল। কিন্তু রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলিবার কালে সেই চেষ্টাকে সাফল্য মণ্ডিত করা কোন রাষ্ট্রশক্তির পক্ষেই সম্ভব নহে।

সদ্য অধিকৃত ও পোড়ামাটি নীতির ফলে বিধ্বস্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা পুনর্গঠন, শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা দুঃসাধ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বিশেষ করিয়া গণচেতনা সম্পন্ন সোভিয়েট রুশিয়ায় তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

তারপর সোভিয়েট রুশিয়ার আবহাওয়া বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

রুশিয়ার কয়েকটি অঞ্চল অত্যধিক শীতপ্রধান। এই কারণে সৈনিকদের বস্ত্র, বাসস্থল এবং রসদ ও গোলাবারুদ সংরক্ষণ ব্যবস্থা অত্যধিক ব্যয় বহুল। উপযুক্ত শীত-বস্ত্র ও বাসস্থানের অভাবে সৈন্যদলে নানারূপ ব্যাধির মহামারী সৃষ্টি এবং রসদ ও গোলাবারুদ সংরক্ষণ ব্যবস্থার ত্রুটির ফলে ইহাদের বিরাট অপচয় অবশ্যম্ভাবী। এই অবস্থায় উল্লিখিত বিষয় গুলির কোন একটির অভাব অথবা ত্রুটিপূর্ণ থাকিবার ফলে বিরাট বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী।

উল্লিখিত প্রতিকূল অবস্থায় নাৎসীবাহিনী কি ভাবে সংগ্রাম চালাইয়া ছিল নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ক্রিমিয়ার সন্নিকটস্থ রণাঙ্গনের কয়েকটি রণাঞ্চলে কয়েকজন নাৎসী সৈনিক যে অত্যদ্ভুত ও অভূতপূর্ব্ব অবস্থায় মৃত্যু বরণ করিয়াছিলেন ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়। রাইফেল হস্তে দণ্ডায়মান অবস্থায় তাঁহাদের মৃত দেহ তুষারান্তরাল হইতে উদ্ধার করা হয়। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, প্রবল তুষারপাত চলিতে থাকিলেও তাঁহারা কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হন নাই। সৈনিক জীবনের কর্ত্তব্য, নিয়মাণুবর্ত্তিতা, ত্যাগ ও সাহসিকতার ইহা অভূতপূর্ব্ব নিদর্শন বলা চলে। ইহাতে হিটলার ও তাঁহার নাৎসী বাহিনীর গৌরব লক্ষগুণ বৃদ্ধি পায় বটে কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও প্রমাণিত হয় যে ঐরূপ অদ্ভুত ও অসাধারণ ত্যাগী, ধৈর্য্যশীল, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও বীর সৈনিককে প্রবল তুষারাপাতের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির হস্ত হইতে রক্ষা করিবার ক্ষেত্রে নাৎসী জার্ম্মানী চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। এইভাবে দেশ ও জাতির কত অমূল্য জীবন যে নষ্ট হইয়াছে ইহার প্রকৃত বিবরণ প্রকাশিত হইবে কি ? আমার বিশ্বাস বিশ্বনরনারীর নিকট ইহা চিরকাল অজ্ঞাত এবং ইহাতে দেশ ও জাতি তথা মানব সভ্যতার যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে তাহা অপূরণীয় থাকিয়া যাইবে।

বৃটিশ শাসন, শোষণ, শিক্ষা ও প্রচারণার ফলে নির্ব্বীর্য্য উদারতায়

অনুপ্রাণিত শান্তিবাদী ভারতীয় নরনারীকে দেশরক্ষার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বোধে সচেতন এবং সক্রিয় করিয়া তুলিতে হইবে। এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই আমি উল্লেখ করিয়াছি যে, শিল্প ও সম্পদহীন ভারতে ইহা অত্যন্ত জটিল ও কঠিন সমস্যা। ইহাও অতীব সত্য যে, যত কঠোর ও দুরূহ হউক না কেন ইহার সুসমাধান ভারতীয় নরনারীকে অবশ্যই করিতে হইবে।

বিমান ও আণবিক শক্তির যুগে পৃথিবীর পরিধি অনেকটা ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বনরনারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনও সেই কারণে প্রায় একই সূত্রে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং দেশরক্ষা অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্য বিশ্বের অধিকাংশ নরনারীর চিন্তাধারা ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টা যে গতিপথ অনুসরণ করিতেছে তাহা নিরোধ প্রচেষ্টা বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে পণ্ডশ্রম। তবে সেই পথের মোড় ফিরাইবার অগ্রদূত ও নিয়ামক হিসাবে ভারতবাসীর স্থান যে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ইহা অস্বীকার করা চলে না।

দেশরক্ষার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বোধকে বলিষ্ঠ ও তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিতে হইলে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা অর্থাৎ আত্মরক্ষার কলা কৌশল প্রত্যেক নরনারীর আয়ত্বাধীন থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি দেশ রক্ষার দায়িত্বের বিভিন্ন দিক বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু উল্লিখিত সচেতনতা অন্তরে জাগরুক থাকিলেই দেশরক্ষা সম্ভব নহে—ইহা সুসম্পাদনের কৌশল অভ্যাস সাপেক্ষ। এই কারণে British General Maude Encyclopodia Britannicaতে (1910) লিখিয়াছেন :—"..........That conscription forms even at the present day chief guarantee for peace, stability and economic development upon the continent of Europe.

According to him—army expenditure had been fly

wheal which had steadied the disorganised finance of post Napoleonic Prussia. Compulsory contact in the conscript Prussian Army had compelled the classes to educate the masses, while the intelligence of the better sort of conscripted men had in turn compelled the Officers to educate themselves better in order to command the respect of their subordinates. Since the trained German's expectation of life about five years greater than that of the untrained, about a millon Germans were alive and doing good work in 1910. who without training would have already been dead and buried. Nor was this the whole social and economic benifit from conscription. Capital had attached to the country by the security guaranted by the numerous army, while the working classes were supported to have become reasonable in their demands on account of..... the habit of self respect and the sense of individulity which they acquire in the army.' Further, conscript service fits for the 'continuous collective effort of organised bodies' required by modern machine industry. Finally, the economic benifits of conscription have been obtained without danger of an aggrasive governmental policy, since it was well known that conscripts, unlike professional soilders, will fight well only for some cause of which they enthusiastically approve."

General Maudeএর অভিমত ও যুক্তি যে শুধু ইউরোপের পক্ষেই প্রযোজ্য তাহা নহে। হৃদয়হীন রক্ষণশীলতা, চরম কুসংস্কার, বর্ণ বিদ্বেষ ও শ্রেণী স্বার্থের কুৎসিত সংঘাত হইতে ভারতীয় সমাজ জীবনকে মুক্ত করিয়া প্রগতিমুখী ও শান্তিপূর্ণ করিতে হইলে তাঁহার বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করা কর্ত্তব্য। অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি স্তম্ভ স্বরূপ কৃষি ও খনিজ সম্পদের উন্নয়ন দ্বারা শিল্প প্রচেষ্টাকে সুগঠিত করিয়া আর্থিক জীবনকে সুদৃঢ় করিবার ক্ষেত্রেও তাঁহার যুক্তি যে অকাট্য ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। তারপর সৈনিক জীবনের নিয়মানুবর্ত্তিতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সঙ্ঘবদ্ধতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, এবং সর্ব্বোপরি ত্যাগবরণ শিক্ষার মধ্য দিয়া রাজনৈতিক চেতনাকে সতেজ ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলিবার ক্ষেত্রে বাধ্যতা-মূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন যে অপরিহার্য্য ইহার সমর্থনে যুক্তি জাল বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। সমাজবদ্ধ মানুষের পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আত্মরক্ষার কলা-কৌশল অনুশীলন হইতে বিরত থাকিবার চেষ্টা আত্মাবমাননা ও আত্মবঞ্চনা স্বরূপ।

কিন্তু Conscription দ্বারা বিরাট সৈন্য বাহিনী গঠন এবং এই ভাবে গঠিত সৈন্যদল লইয়া সংগ্রাম পরিচালনের ভবিষ্যত বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়া প্রুশিয়ার প্রতিভাবান সমর চিন্তানায়ক Von Seeckt তাঁহার Thoughts of a Soilder পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"The soilder must ask himself wheather these giant armies can ever be manoeuvered in accordance with a strategy that seeks a decision, and wheather it is possible, for any future war between······masses to end otherwise than in indecisive regidity."

"Perhaps the principle of the levy in mass of the nation in arms, has out lived its usefulness······.Mass

becomes immobile ; It can not manoeuvre and....can not win victories, it can only crush by sheer weight."

"The soilder, who seeks a decision in nobility, rapidity and inspiration, has grave doubts wheather armed masses can ever secure a decision, and wheather nations in arms can avoid finishing in trenches once more."

"Anyone who has the smallest idea what technical knowledge, what numerous instruments operated only by carefully trained experts, what highly disciplined mental faculties are needed for the effective control of modern artillery fire, must admit that these essential can not be taken for granted with men whose training has been brief and superficial,......such men.......against a small number of practiced technicians........are 'cannon fodder' in the worst sense of the term."

Von Seeckt fore saw future wars divided. as it were, into three acts ; Since the exsisting Air Force will be be immediately available, they will be the stars of the first act, attacking not so much the hostile cities and centers of supply as the opposing Air Forces, and turning against other targets only after defeating those Forces... ..."importance and vulnerability to air attack of hostile troop concentrations, and in general the posibility of hindering the enemy's mobilization of men and supplies by such attacks must also be kept in mind."

In the second act :--the attack initiated by air force will be pressed with all possible speed by all available troops, i. e. in essence, by the regular army. The more effecient this army, the greater its mobility, the

resolute and competent its command, the greater will be its chance of beating the opposing forces rapidly out of the field, of hindering the enemy in the creation and training of further forces and perhaps of making him immediately ready for peace. While the two professional armies are fighting for the initial decision, the creation of defensive forces is in progress behind them. The army that has been victorious will, while drawing its reserves of men and material for the necessary maintenance of its striking power, eassy to prevent the newly formed masses on the other side, superior in numbers but inferior in quality, from developing their strength and above all from forming compact and well equipped fronts."

"Thus the third act;—that of the mass armies spreading themselves, across the theatre of war, may not take place at all, or only as an epilogue working out a foregone conclusion. It will any rate be profoundly affected by the first battles between the regulars,

"Therefore the whole future of warfare appears to me to lie in the employment of mobile armies, relatively small but of high quality and rendered distinctly more effective by the addition of air craft, and in the simultaneous moblization of the whole defence froce, be it to feed the attack or for home defence,"

আক্রমণ পরিচালনের ক্ষেত্রে Von Seeckt এর রণনীতি ও রণ-কৌশল বলিষ্ঠ এবং ইহাতে স্থানীয় সাফল্য অর্জ্জন সম্ভব বটে; কিন্তু গভীর গণচেতনা সম্পন্ন বিরাট দেশের বিরুদ্ধে ঐ ভাবে আক্রমণ চালাইয়া জয় গৌরব অর্জ্জন কোন ক্রমেই সম্ভব নহে। অবশ্য ইহাও সত্য যে ঐরূপ কোন দেশ জয় ও দখল করিবার চিন্তা পোষণই চলে না। তবে বিজ্ঞান বর্ত্তমানে আণবিক শক্তিকে মানুষের করতলগত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার ফলে সমরাস্ত্র হিসাবে মানুষ আণবিক বোমার ব্যবহার শিখিয়াছে। ইহার অত্যদ্ভুত ও মারাত্মক রূপ আমরা হিরোশিমা দ্বীপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জাপ-দ্বীপে আণবিক বোমা বর্ষিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহার প্রলয়ঙ্কর বিধ্বংসী ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষের বাস্তব ধারণা ছিল না। আণবিক বোমার উদ্ভাবকগণ ইহার খণ্ড প্রলয় সৃষ্টিকারী ক্ষমতা সম্পর্কে হয়ত খানিকটা ধারণা পোষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং এই কারণেই উহা ইউরোপীয় রণাঙ্গনে ব্যবহৃত হয় নাই। কারণ আমার দৃঢ় অভিমত এই যে, আণবিক বোমাকে মানবিক ভাষায় সমরাস্ত্র বলিয়া অবিহিত করা চলে না। সংগ্রামের অর্থ যদি জাতিগত উৎসাদন (Genocide) বুঝায় তাহা হইলে আণবিক বোমাকে সেইরূপ রণাঙ্গনে ব্যবহার যোগ্য সমরাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করা চলে। ইহা ব্যবহারের পূর্ব্বে ইঙ্গ-মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষ যে উহাকে সেই শ্রেণীর অস্ত্র বলিয়া গণ্য করিতেন ইহা স্বতসিদ্ধ। অন্যথায় তাঁহারা পশ্চিম রণাঙ্গনে অবশ্যই ইহা বর্ষণ করিতেন। ইউরোপীয় রণাঙ্গনে আণবিক বোমা বর্ষণ ইউরোপীয় সমরনায়ক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাহসে কুলায় নাই। অর্থাৎ ইহার খণ্ড প্রলয় সৃষ্টিকারী ক্ষমতা ইউরোপকে বিধ্বস্ত করুক ইহা তাঁহারা কল্পনায়ও স্থান দিতে পারেন নাই। কিন্তু জাপ দ্বীপ অথবা জাপজাতি বিশ্বের বুক হইতে নিশ্চিহ্ন হইলে শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান পুঁজিবাদের লাভ ব্যতীত কোন ভাবেই ক্ষতি হইবে না ইহা সম্যক ভাবে হৃদয়ঙ্গম

করিয়াই তাঁহারা অমানবিক ভাবে আণবিক বোমা হিরোশিমায় বর্ষণ করিয়াছিলেন। ইহার ফলে শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান পুঁজিবাদী দল ব্যতীত বিশ্বের অবশিষ্ট নরনারীর মনে তাঁহাদের সম্পর্কে কিরূপ মনোভাব দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে তাহা বিকলন নিষ্প্রোজন। তিনি ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে দ্রুত গঠিত ও সামরিক শিক্ষা প্রাপ্ত বাহিনী সংগ্রাম কুশলতা লাভ করিতে পারে না। কিন্তু নৈতিক বল ও আদর্শের প্রেরণা যে সৈনিক জীবনের শ্রেষ্ঠ শক্তি ইহা অস্বীকার করা সম্ভব কি? ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসে আমরা "The Famous Five hundred from Marseilles" এর যে কাহিনী জ্ঞাত হই তাহা উপেক্ষা করা চলে কি? উক্ত বিবরণে আমরা দেখিতে পাই:—The Famous Five Hundred from Marseilles who led the storming of the Tuilories palace on August 10, 1792, were composed of middle class Volunteers, they left their southern city in the evening of July 2, after drilling for only three days under elected officers. Dragging two little guns with them by man power through the summer heat, they marched no less than five hundred miles at the astonishing rate of 18 miles a day, entering Paris on July 30, with every single man present for roll call at the end of their dash. এইরূপ দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি উল্লেখ করা চলে।

খণ্ডিত ভারত বর্ত্তমানে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের দ্বারা পরিবেষ্টিত ইহার প্রকৃত অবস্থা আমি পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করিয়াছি। ইহাতে দেখা গিয়াছে যে, (১) শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান পুঁজিবাদের বিশ্ব গ্রাসী ক্ষুধা। (২) সোভিয়েট রুশিয়ার বিশ্ব

বিপ্লব সৃষ্টির পঙ্গুচক্রান্ত (৩) মুসলিম রাষ্ট্রসংহতি এবং (৪) বৌদ্ধ রাষ্ট্র সংহতির একক অথবা ইহাদের যৌগিক শক্তির প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ নীতির প্রভাব ও কার্য্যকলাপের বলিষ্ট সক্রিয়তা আমাদের বিভিন্ন সীমান্তকে নানাভাবে বিপদাঙ্কীন করিয়া তুলিতেছে। তম্মধ্যে চতুর্থ শক্তি অর্থাৎ বৌদ্ধ রাষ্ট্রসংহতি জনিত ভীতিকে নির্ব্বিচারে বাতিল করা চলে। ইহাও আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তৃতীয় শক্তি অর্থাৎ মুসলিম রাষ্ট্রসংহতি আমাদের পক্ষে ভীতির কারণ হইলেও আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাই, ইউরোপীয় রাষ্ট্রগোষ্ঠি ইহাতে সর্ব্বাধিক শঙ্কিত এবং সেই ক্রমবর্দ্ধমান ভীতি নিরসনের জন্য তাঁহাদের কুটচক্রান্ত অত্যধিক বলিষ্ঠ নীতি ও চরম বক্র পথ ধরিয়া অশ্রান্ত গতিতে ধাবিত হইতেছে। সুতরাং মুসলিম রাষ্ট্রসংহতি জনিত ভীতি বিশেষ আতঙ্কর নহে বলিয়া আমরা গণ্য করিতে পারি। তবে বৌদ্ধরাষ্ট্র সংহতি সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ উদাসীন মনোভাব অবলম্বন সম্ভব হইলেও মুসলিম রাষ্ট্রসংহতিকে আমরা কোন ক্রমেই উপেক্ষা করিতে পারিনা। মুসলিম রাষ্ট্রসংহতি ভারতকে গ্রাস করিতে সমর্থ না হইলেও ইহার উগ্র সমর্থক দল শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান পুঁজিবাদের ‘অছি’র ক্রীড়নক বলিয়া ভারতের উন্নতি ও প্রগতিকে প্রতি পদে পদে বিপদাঙ্কীন করিবার ক্ষেত্রে নানা ভাবে ব্যবহৃত হইবে। মধ্যপ্রাচ্য ও পাকিস্থানের মুসলিম সমাজ যে ইঙ্গ-মার্কিন পুঁজিবাদের রাজনৈতিক জুয়ায় রং এর তাস স্বরূপ ইহা আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এই কারনেই আমি চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচনায় ইহাও উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছি যে মুসলিম রাষ্ট্রসংহতি অথবা বৈদেশিক স্বার্থের প্রভাবে পাকিস্থান ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কাশ্মীরের বিষয় উল্লেখ করা চলে। অবশ্য এই ক্ষেত্রে ইঙ্গ-মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষ War of Intervantion এর নীতি অ

অনেকে হয়ত আমার এই অভিমতের বিরোধিতা করিবেন। কিন্তু কূটনৈতিক দৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করিয়া তীক্ষ্ণ ভাবে যাবতীয় ঘটনাবলী অনুধাবন করিলে পরিস্কার বুঝা যাইবে যে, তদানীন্তন অবস্থায় পাকিস্থানের পক্ষে ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া নিশ্চিন্তভাবে ধ্বংসের পথ সুপ্রশস্ত করিয়া তোলা ব্যতীত অপর কিছু নহে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কূটনৈতিক চালবাজীতে বিভ্রান্ত হইয়া ভারতীয় রাষ্ট্রনায়কগণই সখাদ সলিলে মগ্ন হইতে বসিয়াছেন। কাশ্মীর সমস্যা ঘোরালো হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান পুঁজিবাদের প্রচার যন্ত্র এই ভাবে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল যে কাশ্মীর সমস্যা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জ্জাতিক প্রশ্ন। সুতরাং এই ক্ষেত্রে ভারত পাকিস্থানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলে ইঙ্গ-মার্কিন কর্ত্তৃপক্ষ হয়ত ভারতের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে বাধ্য হইবেন। এই-রূপ প্রচারণার উদ্দেশ্য ভারতকে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের দরজায় ধর্না দিতে বাধ্য করা। তাঁহাদের চক্রান্তই জয় যুক্ত হইল। ভারতীয় রাষ্ট্রনায়কগণ যে ঐ বিষয়ে বিরাট ভুল করিয়াছেন তাহা তাঁহারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং উল্লিখিত রূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা বিস্মৃত হইলে চলার পথে ভারতীয় নরনারীর বোঝাই ভারী হইয়া উঠিবে।

দ্বিতীয় পক্ষ সোভিয়েট রুশিয়ার ভারত আক্রমণ নীতি ও বিশ্ব-বিপ্লব সৃষ্টির যাবতীয় দিক আমি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। যে কোন দৃষ্টিকোণ হইতে কোন যে কোন মনোভাব লইয়া উহার সূক্ষ্ম সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে কম্যুনিজম মানব সমাজ জীবন পরিচালনের আদি, অকৃত্রিম ও স্বতঃফূর্ত্ত চিন্তা ধারা। 'The mode of production and distribution dominates as a rule the social, economic, political

and asthetic life of man' এই যুক্তি অকাট্য, অভ্রান্ত ও দিবালোকের ন্যায় সত্য। আরও দেখা যায়, Primitive Communism, এর গতিমুখ হইতে সমাজ জীবন নানা যৌক্তিক ও অযৌক্তিক কারণে অনেকটা নরনারীর সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে মোড় ঘুরাইয়া ভিন্ন পথে পরিচালিত হইয়াছিল। ইহার বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র ইহা নহে। ততোধিক চিন্তাশীল ও rational নরনারী মাত্রেই ইহার সহিত সুপরিচিত। এক কথায় বলা যায়, Communism জগৎ ও জীবনের পটভূমির উপর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিপাত। ইহা মোটেই অভিনব নহে। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য। কারণ Struggle for existance ও Survival of the fittest এই দুইটি তত্ত্বকথার নূতন উপলব্ধি সৃষ্টিই Communism এর সারতত্ত্ব। দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় আমি ব্যাখ্যা করিয়াছি যে, চূড়ান্ত বায় প্রদানকরিবার কেহ থাকুক অথবা না থাকুক মানুষ স্বীয় সাধনা ও কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে যে, এই ধরিত্রীর বুকে মানুষ শ্রেষ্ঠতম জীব। অর্থাৎ Struggle for existance এর ক্ষেত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে, man is the best animal to survive in this wörld, other things remaing equal. সুতরাং আজ সত্যই প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে যে, বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার লইয়া মানুষের সহিত মানুষের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম পরিচালন যুক্তিযুক্ত ও বাঞ্ছিত কি? তারপর জীব জগতে মানুষের শক্তি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ইহাই যদি স্বীকৃত হয় তাহা হইলে সেই শক্তির প্রয়োগ ক্ষেত্র কোথায়? দুর্ব্বলকে সবল, অক্ষমকে সক্ষম, অজ্ঞানকে বিজ্ঞ করিবার জন্য সেই শক্তি ব্যয়িত হইবে, না ঠিক ইহার বিপরীত উদ্দেশ্য সফল করিবার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে? দ্বন্দ্ব সমুৎপন্ন জড়বাদের ভিত্তিতে রচিত কম্যুনিজম উল্লিখিত গভীর ও কঠোর প্রশ্নদ্বয়ের সমাধানের সূত্রসন্ধানী আলোক মাত্র। তবে ইহা প্রক্ষেপণের

কলা কৌশল লইয়া বিতর্কের উদ্ভব অত্যন্ত স্বাভাবিক। সোভিয়েট রুশিয়ার কম্যুনিষ্ট নেতৃবৃন্দ ইহা লইয়া হাতে কলমে গভীর ও বিরাট পরীক্ষা কার্য্যে রত, সেই কারণে ইহা কোন ক্রমেই অবিসম্বাদীত ও ধ্রুব বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া চলে না যে তাঁহারা অভ্রান্ত এবং তাঁহাদের প্রচেষ্টা প্রশ্নাতীত। দ্বন্দ্ব সমুৎপন্ন জড়বাদ, মার্ক্সবাদকে উত্তরাধিকারী সূত্রে দাবী করিবার অধিকার কাহারও নাই। বিশ্ব নরনারীর অধিকার ইহার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

সুতরাং সোভিয়েট রুশিয়ার আক্রমণ নীতির যে দুইটি দিক আমি চতুর্থ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করিয়াছি ইহার প্রথম অর্থাৎ সশস্ত্র লাল ফৌজের অভিযান প্রতিরোধ আমাদের পক্ষে সম্ভব হইলেও দ্বিতীয় অর্থাৎ সশস্ত্র লাল ফৌজের পোষণে বিশ্ব-বিপ্লব সৃষ্টিকারী কম্যুনিষ্ট দলের প্রচার ও অন্যান্য কার্য্যকলাপ বন্ধ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহার কারণ বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। এক কথায় বলা যায়, একদল সশস্ত্র বাহিনীকে প্রতিরোধ ও পর্য্যুদস্ত করা সম্ভব কিন্তু বাস্তবের কঠোর সংঘাতের বুকেই ভাব ও চিন্তার উৎপত্তি—ইহা অজেয়। সুতরাং সামরিক প্রস্তুতির বিষয় সেই ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অসম্ভব।

ইউরোপীয় রাষ্ট্র গোষ্ঠির মধ্যে বৃটিশ ভারতের পুলিসী দায়িত্ব ত্যাগ করিয়াছে—অপর দুইটি শক্তি ফ্রান্স ও পর্ত্তুগাল বৃটিশের পন্থা অনুসরণের জন্য বাধ্য হইতেছে। তবে শেষোক্ত পক্ষদ্বয়ের মনোভাব ও নীতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, ফ্রান্স চন্দন নগর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও, সমুদ্র তীরবর্ত্তী দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক অধিকার সহজে ত্যাগ করিতে সম্মত নহে। পর্ত্তুগালও ফ্রান্সের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে বদ্ধপরিকর। ইহার পশ্চাতে যে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি বিদ্যমান তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

বৃটিশ ভারতের পুলিসী দায়িত্ব কেন ত্যাগ করিল ইহা আমি তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করিয়াছি। ইহার সারতত্ত্ব—বৃটিশের শূন্য

স্থান দখলকারী শক্তি বর্ত্তমানে আর নাই এবং উল্লিখিত দায়িত্ব পরিত্যক্ত হইলেও যান্ত্রিক সভ্যতায় অনুপ্রাণিত ও আণবিক শক্তিধর শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান পুঁজিবাদের অর্থ নৈতিক শাসন ও শোষণের পথ অবাধ ও সুগম হইয়া উঠিবে। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায় গুলিতে ইহার বিভিন্ন দিক বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষিত হইয়াছে। সুতরাং আমরা নিঃসংশয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে ভারতে আঞ্চলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা ইউরোপীয় রাষ্ট্র গোষ্ঠির বিশেষ করিয়া বৃটিশের মোটেই নাই। দ্বীপবাসী বণিকের প্রেরণা ও দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তাঁহাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ নিরঙ্কুশ রাখিবার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অংশের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান গুলিতে তাঁহারা যে ভাবে ঘাঁটি করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিলে স্বতঃই শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে অত্যন্ত অনগ্রসর এশিয়াবাসী বিশেষ করিয়া ভারতীয় নর-নারীর অন্তর গভীর হতাশার বেদনায় সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। কিন্তু সুস্থ ও সবল মন লইয়া উল্লিখিত সমস্যা সমাধানের সূত্র অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় আপাত দৃষ্টিতে ইহা কঠোর ও সমাধানাতীত প্রতিভাত হইলেও মূলত তাহা মোটেই ভীতিপ্রদ নহে। দ্বীপবাসী বৃটিশ ও অপর কয়েকটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র বর্ত্তমানে বিশ্বের জলপথ নিয়ন্ত্রন দ্বারা প্রভুত্ব ও প্রাধান্য রক্ষা করিতেছেন বটে, কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে বিশ্বের সর্ব্ববৃহত্তম স্থলভাগ এশিয়ার নরনারীই বৃক্ষকাণ্ডে ও পর্ব্বত গুহায় সংসার যাত্রা নির্ব্বাহকারী অর্দ্ধমানব গোষ্ঠিকে 'পথ ও পাথেয়'র' সন্ধান দিয়াছিলেন। পারিপার্শ্বিক নানা অবস্থার চাপে 'গতি'র প্রতিযোগিতায় এশিয়ার জাতীয় জীবনে যে সাময়িক ছেদ ঘটিয়াছিল দ্বীপবাসীর দল ইহার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহার পরমায়ু ফুরাইয়াছে। পৃথিবীর দুইতৃতীয় অংশ জলভাগ। এই বিশাল বাধা অতিক্রমে ব্যর্থ হইয়া এশিয়াবাসীর জীবনে যে গাঢ়তমিস্রা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা

দূরীভূত করিবার 'পথ ও পাথেয়'র সন্ধান ভারতীয় নরনারীকেই দিতে হইবে।

ভারত এশিয়ার পীঠস্থান, যুগে যুগে শান্তি ও প্রগতির মন্ত্রে দীক্ষিত ভারতীয় নরনারী এশিয়ার অন্ধকার বুকে আলোক বর্ত্তিকা তুলিয়া ধরিয়া ছিল। সেই মহান ও বিরাট নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান আজ বজ্রেরধ্বনিতে ঘোষিত হইতেছে। দুর্দ্দিনের ক্ষণে দুর্গম পথে ভারতীয় নরনারীকে অবশ্যই যাত্রা সুরু করিতে হইবে।

কারণ আণবিক বোমাস্বরূপ অমানবিক অস্ত্রসজ্জিত শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান পুঁজিবাদীদল ভবিষ্যত যুদ্ধ কিভাবে পরিচালন করিবেন তাহা Hoffman Nikersonএর চিন্তাধারার মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন :—

"......the future of war......not fighting, but famine, not the slaying of men, but the bankruptcy of nations and break-up of the whole social organisation......... in such a stalemate or deadlock......"soilders may fight as they please ; the ultimate decision is in the hands of famine. Not generalship but economic factors or rather the capacity of civilians to resist economic pressure will be deeisive. The quality of toughness or capacity of endurance of patience under privation, or stubborness under reverses and disappointments......in the civil population will be...deciding factor in modern war."

আমরা দেখিতে পাই এশিয়ার—কোটি কোটি নরনারীর সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে হিমালয় প্রমান বাধারূপে যে ব্যবধান

মাথা উঁচু করিয়া দণ্ডায়মান ছিল, উহা সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের পরিধির মধ্যে নিহীত নহে। ইহা একান্ত ভাবে প্রাকৃতিক। বিশাল এশিয়ার মধ্যস্থলে মধ্যমণিরূপে যে হিমগিরি অসহনীয় শীতলতা লইয়া সগর্ব্বে মাথা উঁচু করিয়া বিরাজমান ইহারই শীতলতা এশিয়ার নরনারীর কর্ম্মজীবনকে শত ভাবে শিথিল করিয়া তুলিয়াছে। এই বাধাকে অবশ্যই জয় করিতে হইবে। অর্থাৎ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে স্থলেপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিরাট অন্ত-রায় হিমালয় পর্ব্বতমালার বাধা অবশ্যই অপসারণ করিতে হইবে। আসাম-ব্রহ্ম সীমান্ত অঞ্চল দিয়া ভারত-চীন এবং কাশ্মীর সীমান্তের গিলগিট অঞ্চল দিয়া রুশ-ভারত রেলপথ ও চক্রচালিত যান চলাচল যোগ্য পথ নির্ম্মিত হইলে দ্বীপবাসী বৃটিশ কর্ত্তৃক সমুদ্র পথের উপর কর্ত্তৃত্বও অধিকার রক্ষা করিয়া বাণিজ্যিক স্বার্থকে নিরঙ্কুশ ও অপ্রতিহত রাখিবার যাবতীয় ষড়যন্ত্র পরিপূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হইবে। উল্লিখিত কাজ কি অতীব কঠোর—নিতান্ত অসম্ভব? ভারত ও চীনের—৮০ কোটির অধিক নরনারীর মধ্যে কয়েক কোটির জীবন বলি দিয়া ঐ দুইটি চলাচল পথ প্রতিষ্ঠিত হইলে শান্তি, সমৃদ্ধি ও আলোকের বন্যা যে গতিবেগ লইয়া প্রবাহিত হইবে তৎফলে শুধু এশিয়া নহে, বিশ্ব সভ্যতার স্তিমিত দীপশিক্ষাও অত্যুজ্জ্বল প্রভায় ঝলমল করিয়া উঠিবে। প্রাচ্যের বিরুদ্ধে প্রতীচী আজ যে গভীর ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করিয়া কোটি কোটি নরনারীর জীবন লইয়া গেণ্ডুয়া খেলিবার নেশায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে সেই নেশা কার্য্যকরভাবে ব্যর্থ করিবার ইহাই প্রথম ও প্রধান উপায়—সূত্র, অথবা মন্ত্র। সুতরাং আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনকে সুগঠিত ও সুদৃঢ় এবং উহার ভিত্তিতে দেশরক্ষা ব্যবস্থাকে বলিষ্ট করিয়া আত্মরক্ষা তথা এশিয়ার শান্তি,সুখ, সমৃদ্ধি ও নিরপত্তাকে নিরঙ্কুশ করিতে হইলে দিল্লী—ক্যাণ্টন এবং দিল্লী—মস্কো ট্রেন চলাচল ব্যবস্থা অবশ্যই সুপ্রতিষ্টিত করিতে হইবে। এই বিরাট ও সুকঠোর কর্ত্তব্য সম্পাদনের দায়িত্ব

অবশ্যই ত্রিশ কোটি ভারতীয় নরনারীকে গ্রহণ করিতে হইবে। ভারত চীন এবং ভারত-রুশ সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐক্যও-সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার জন্য সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রে উল্লিখিত বিষয়টিই সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করিতে হইবে এবং ইহাই হইবে ভারতীয় নরনারীর দেশরক্ষা সংগঠন—ভারতের রণনীতি ও সমর সজ্জার মূল সূত্র।

শেষ